১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০১২

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, pcjss@hotmail.com
ওয়েব: www.pcjss-cht.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ: ০৬-৫৪

বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন ও সংগ্রাম : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ◆ সজীব চাকমা ০৬

এম এন লারমার জীবন ও চিন্তা : বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ◆ প্রফেসর মংসানু চৌধুরী ১১

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস ◆ এ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত ১৪

এম এন লারমার আত্মত্যাগ, বিভেদপন্থী চক্রান্ত এবং আমাদের করণীয় ◆ সমীচিন চাকমা ১৬

বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্র, সংঘাত ও জেএসএস-ইউপিডিএফ সমঝোতা ◆ উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা ১৯

দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন : কথিত জাতীয় ঐক্য দীপায়ন খীসা ২২

এম এন লারমার নির্দেশিত পথই মুক্তির পথ ◆ বিনয় কুমার ত্রিপুরা ২৫

চেতনার পথপ্রদর্শককে শ্রদ্ধাঞ্জলি ◆ চিংলামং চাক ২৮

এম এন লারমার চেতনা অপরাজেয় ◆ ধীর কুমার চাকমা ৩০

দ্য স্কাই পিপল ডু নট লার্ন ◆ সঞ্জীব দ্রং ৩৩

ঃপাকিস্তানের পরিণতির দিকে অভিযাত্রা! ◆ মুনীরুজ্জামান ৩৮

সাম্প্রদায়িকতা বনাম গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ◆ শক্তিপদ ত্রিপুরা ৪০

জাতিরাষ্ট্রে জাতিগত সমস্যা ও এর সমাধান : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ◆ মঙ্গল কুমার চাকমা ৪৪

অপহরণ ◆ স্নেহ কুমার চাকমা ৪৯

কবিতা ৫৫-৫৫

এম এন লারমা ◆ শেকড় ত্রিপুরা ৫৫

কৃষ্ণ কিশোর চাকমার স্মরণে ৫৫

বিশেষ প্রতিবেদন ৫৬-৬৬

২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ সংঘটিত রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলা ৫৬

২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বক্তব্য ৫৮

আদিবাসী বিরোধী সরকারি চিঠি জারীর ফলে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও কতিপয় স্থানে পুলিশী বাধাদানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত ৬২

‘অসাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ চাই’-এর ব্যানারে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত সম্প্রীতি ও প্রতিবাদ সমাবেশের ঘোষণাপত্র ৬৪

সংবাদ প্রবাহ ৬৭-৮৭

সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল ৬৭

জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৭০

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন ৭৩

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা ৭৪

সাংগঠনিক সংবাদ ৮০

সম্পাদকীয়

বিভেদপন্থী ও চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করুন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করুন

২০১২ সাল, ১০ নভেম্বর। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণের মানুষ ও বিশ্বের মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) এর ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতি তথা দেশের সকল নিপীড়িত জাতি ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য এ এক গভীর শোকাবহ ও তাৎপর্যময় দিন। সেই সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে নিজেকে সমর্পণের, আত্মত্যাগের, জীবন উৎসর্গের এক অনুপ্রেরণারও দিন। তরুণ বিপ্লবীদের কণ্ঠে তাই বজ্র-নিনাদ আওয়াজে অমিততেজী শ্লোগান ধ্বনিত হয় 'এম এন লারমার স্মরণে, ভয় করি না মরণে'। এম এন লারমা শিখিয়ে গেছেন কিভাবে সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যায়। আত্মবলিদানের সুমহান পথে নিজেকে সমর্পিত করতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার এক সাহসী নাম– এম এন লারমা।

১৯৮৩ সালের এই দিনেই জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, সাবেক সংসদ সদস্য, এ দেশের নিপীড়িত জাতির জাতীয় মুক্তির প্রবক্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্টিরই অভ্যন্তরস্থ একদল বিশ্বাসঘাতক, বিভেদপন্থী ও উপদলীয় চক্রান্তকারীর অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। পার্টির বৃহত্তর স্বার্থ ও জাতির ঐক্যের কথা ভেবে তিনি বিভেদপন্থী ও উপদলীয় চক্রান্তকারীদের ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন, শান্তিপূর্ণভাবে যাতে সকলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবোঝি শুধরে উঠতে পারেন তার জন্য তিনি উপস্থিত করেছিলেন এক উপায় 'ক্ষমা করা, ভুলে যাওয়া'। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চেতনা ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, কিন্তু চক্রান্তকারীরা ছিল সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন এবং ষড়যন্ত্রের পাঁকে নিমজ্জিত স্বার্থান্ধ ও অপরিণামদর্শী। ফলে বিভেদপন্থীরা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সেই সমাধানের পথে এগিয়ে যাননি। বরং হত্যা করে জুম্ম জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে এবং তাঁর সাথে আরও আট জন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক বন্ধুকে।

অপরিণামদর্শী ও বিবেকবর্জিত সেই চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এর নেতৃত্বাধীন বিভেদপন্থীরা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করে সেদিন যে অপরিসীম ক্ষতি ডেকে এনেছিল তা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখোমুখি জুম্ম জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির সৃষ্টি করে। সেদিন তারা কেবল জুম্ম জাতির নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক ও অভিভাবককে হত্যা করেনি, কেবল জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অগ্রযাত্রার বুকে ছুরিকাঘাত করেনি, সেদিন তারা জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের গৌরবময় ইতিহাসেও চিরদিনের জন্য কালিমালেপণ করে এবং জুম্মদের জাতীয় জীবনে বিভেদ ও ঘৃণার বিষাক্ত বীজ বপন করে। ইতিহাস সেই ঘাতকদের ক্ষমা করেনি। তারা আজ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত এবং সকলের ঘৃণার পাত্র। মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করেও বিভেদপন্থী ও তাদের দোসরদের সেই হীন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। গৃহযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর পার্টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আন্দোলনের গতি দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এক পর্যায়ে সরকার ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই চুক্তিকে বিরোধিতা করে সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট জাত্যাভিমানী মৌলবাদী অপশক্তির সহায়তায় ইউপিডিএফ নামধারী নব্য ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্ভব ঘটে। প্রায় ১৪ বছর ধরে ইউপিডিএফ পার্বত্য অঞ্চলে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে ১৯৮২ সালে বিভেদপন্থীরা কার্যত নিঃশেষ হলেও চার কুচক্রীর অন্যতম দোসর রূপায়ণ দেওয়ান ও তাতিন্দ্র লালরা ঘাপটি মেরে থেকে যায়। দীর্ঘকাল তারা পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনকে যেন সংগঠিত করা না যায় সেই লক্ষ্যে তারা পার্টির মধ্যে গোপনে ক্ষুদে উপদলবাদের জন্ম দেয়। তারা ধীরে ধীরে শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের সাথে আঁতাত করে পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে পার্টি কংগ্রেসে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ প্রয়াসও চালানো হয়। কিন্তু দেশের বিশেষ বাস্তবতায় ২০০৭ সালে পার্টির সভাপতি সন্তু লারমাসহ আরো কয়েকজন প্রবীণ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, সত্যবীর দেওয়ান ও লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমাকে পার্টির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সরকারের একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সে ষড়যন্ত্রও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাসত্ত্বেও অদ্যাবধি এই আদর্শচ্যুত, বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী রূপায়ণ ও তাতিন্দ্র

গংরা পার্টি ও জুম্মস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সন্ত্রাসী ও বিপথগামী সংগঠন ইউপিডিএফ-এর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে রূপায়ণ-তাতিন্দ্ররা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বানচালের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমাসহ পার্টির দায়িত্বশীল সদস্যদের হত্যা করা বা অন্য কোন উপায়ে সরিয়ে দিয়ে জনসংহতি সমিতির সর্বময় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র এখনও রূপায়ণ-তাতিন্দ্ররা চলমান রেখেছে। এই ক্ষুদে দলবাজদের ষড়যন্ত্র থেকে পার্টি, জুম্ম জনগণ তথা সমগ্র দেশবাসীকে সজাগ থাকেতে হবে। ইউপিডিএফ, সরকারের বিশেষ মহল আর এই ক্ষুদে দলবাজদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম মোকাবেলা করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সময়ের দাবি। দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এই কার্যক্রমকে জোরালো করতেই হবে।

১৯৯৭ থেকে ২০১২ এই সুদীর্ঘ সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোন সরকারই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বিগত চার বছর মেয়াদকালে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে চুক্তি মোতাবেক ক্ষমতায়নের পরিবর্তে অথর্ব অবস্থায় রাখা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে পরিণত করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও দুর্নীতির আখড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠতে পারেনি। চুক্তিতে সন্নিবেশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধানটি লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। অব্যাহতভাবে সমতল অঞ্চল থেকে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকছে ও বসতি গড়ে তুলছে। তারা পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের জায়গা-জমি জবরদখল করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে এহেন অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীসহ দেশে-বিদেশে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। বস্তুতঃ অনেক কালক্ষেপণ হয়েছে, আর দেরি করা নয়। অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বর্তমান সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

দেশের আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। অতি সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার হীন উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদ, আদিবাসী নারীর উপর ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণসহ নৃশংস সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী জুম্মদের উপর মৌলবাদী গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালিরা এক বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। গেলো ২৯-৩১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও পটিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও বসতবাড়িতে পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। রামু ও রাঙ্গামাটির ঘটনার আগে হাটহাজারী, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-জিঘাংসার শিকার এসব মানুষ এখন তীব্র আতংকের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য যে, এসব লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় জড়িত কাউকেই বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়নি। প্রকৃত সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাদের সাহসের সাথে পরিচিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে এ ধরনের বর্বরোচিত, মানবতাবিধ্বংসী, গণতন্ত্র পরিপন্থী নাশকতামূলক কর্মকান্ড বার বার ঘটতে থাকবে।

তাই আসুন, সকল প্রকার বিভেদপন্থী ও চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বাত্মক প্রতিরোধ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামকে আরো গতিশীল করি এবং বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণসহ দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করি।

বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন ও সংগ্রাম বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

॥ সজীব চাকমা ॥

আদিবাসী জুম্মরা প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে, যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত, সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনে জর্জরিত, দারিদ্র পীড়িত ও অবহেলিত এ জীবন পূর্ব-নির্ধারিত, এ তাদের পূর্বজন্মের পাপ-পূণ্যের কর্মফল, নিয়তি নির্ধারিত এ সমাজ, এ জীবনের কোন পরিবর্তন বা কোন প্রকার সামাজিক প্রগতি যেন তাদের হাতে নেই! তাই তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল অথবা তাদের মনেই ছিল না যে, তারাও অন্য সকলের মত মানুষ। তাদেরও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। নিজেদের ঐতিহ্য, ভূমি ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারার বিকাশ সাধনের অধিকার তাদেরও থাকতে পারে। তারা যথাযথভাবে ভাবতেও পারেনি যে, বিশ্বের অন্য সকল জাতি বা মানবগোষ্ঠীর মত তাদেরকেও হয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির পথে যেতে হবে, নয়তো ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে ধাবিত হতে হবে। কিন্তু বিলুপ্তির দিকে ধাবমান এমনি এক সমাজের মধ্যেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সর্বপ্রথম জোরান্দোলন, জাগরণ এবং সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির বাণী সঞ্চারিত করতে সক্ষম হন।

> সে সময় তিনি সংসদে বলেছিলেন– '...বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।'

বস্তুত তিনি সেই ষাট দশকেই তরুণ বয়সে সমাজ বিকাশের ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কেবল সমাজ বিকাশের এই বিপ্লবী তত্ত্বই অধ্যয়ন করেননি, তিনি তা বাস্তব প্রয়োগের কাজেও অংশগ্রহণ করেন এবং এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সৃজনশীলতার সাথে গভীর বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। আর এ কারণেই তিনি অন্যান্যদের থেকে আলাদা। শত সুযোগের মধ্যে থেকেও তিনি সুবিধাবাদ ও স্বার্থবাদে আবদ্ধ হননি; বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা সুসজ্জিত হন বটে, তবে অতিবাম বা হঠকারিতা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি একাধারে যেমনি জুম্ম জাতীয়তাবাদী, তেমনি আন্তর্জাতিকতাবাদীও। শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বাসী হয়েও তিনি সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিকদের বিভিন্ন জাতির মানুষকে নিয়ে জুম্ম জাতীয়তাবাদ বিকশিত করার মধ্য দিয়ে জুম্মদের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবতীর্ণ হন। একজন বিপ্লবী হিসেবে তিনি পশ্চাদপদ বৈষম্যমূলক জুম্ম সমাজে বিপ্লব সংঘটিত করতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণে নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজকে যথার্থভাবে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করে। আর জুম্ম সমাজের বিপ্লবের পথে বাংলাদেশী উপনিবেশবাদ তথা ইসলামী সম্প্রসারণবাদ, আমলা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্তবাদ ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিই সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত নির্যাতন-নিপীড়ন এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান তথা বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন পরাধীন জাতি ও অধিকার বঞ্চিত মেহনতি মানুষের অধিকারের পক্ষে সদা সোচ্চার ও আপোষহীন। মানুষ হিসেবেও তিনি সুসমঞ্জস নীতি-নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব ও সংবেদনশীল মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়েও তিনি গভীর সচেতনতার অধিকারী ছিলেন তা আজ সর্বজনবিদিত।

এম এন লারমার স্বপ্ন ও সংগ্রাম

বিপ্লবী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন বলে তিনি সবসময়ই শোষণমুক্ত ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। তিনি এদেশের পাহাড়ি-বাঙালি তথা সকল মানুষের অধিকার ও মুক্তির কথা লালন করতেন। তিনি অনগ্রসর জুম্ম জাতির অধিকারের জন্য অবিচল

থাকলেও কোন সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রশ্রয় দেননি এবং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আক্রান্ত হননি। অপরদিকে সকল জাতির অধিকারের কথা এবং বাংলাদেশের নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের অধিকারের কথা বললেও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা জাত্যাভিমানকে কখনো মেনে নেননি, বরং অসীম সাহসিকতার সাথে এর বিরুদ্ধে সর্বত্র লড়াই চালিয়ে গেছেন। এই উগ্র জাতীয়তাবাদের রক্তচক্ষু তাঁকে সংগ্রামের পথ থেকে কখনও টলাতে পারেনি। সংখ্যালঘু জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল ও জনগণের প্রতিনিধি হয়েও তিনি সংসদে জোরালোভাবে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকারের কথা, বিশেষত শোষিত ও নিপীড়িত, গরীব ও মেহনতি মানুষের কথা বারবার উচ্চারণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর সামগ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন– '...আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। ...আজকে যারা কল-কারখানার চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাঁদের রক্ত চুইয়ে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ, প্রতিটি জিনিস তৈরি হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের কথা এখানে নাই।'

সেদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে যেমনি, তেমনি দেশের প্রেক্ষাপটেও তিনিই প্রথম সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নারীর অধিকারের কথা উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন– '...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।'

অনেক বিতর্ক সত্ত্বেও সংবিধান বিল গ্রহণের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন– 'মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ- কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'।'

বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার 'আমাদের দেশ', 'আমাদের জন্মভূমি' বলে উল্লেখ করেন। উক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি- তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে এমন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ, হিংসা, দ্বেষ, শোষণ-বৈষম্য থাকবে না, নারী-পুরুষ সম-অধিকার ও সমমর্যাদা ভোগ করবে, যেখানে মনুষ্যত্ব থাকবে সবকিছুর উর্ধ্বে অর্থাৎ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতায় পরিপূর্ণ এক মানবিক সমাজ।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এমন এক বাংলাদেশ চেয়েছিলেন যেখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সংখ্যালঘু জুম্ম জনগোষ্ঠীও তার জাতীয় আত্মপরিচয়, সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। বাংলাদেশ হবে বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতি ও বহু জাতির বৈচিত্র্যময় এক দেশ। সে সময় তিনি সংসদে বলেছিলেন– '...বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন– 'আমরা করুণার পাত্র নিয়ে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসেবে। তাই মানুষ হিসেবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম ও বেড়ে উঠা বিধায় তিনি অত্যন্ত কাছে থেকে ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ও বিজাতীয় নানা বঞ্চনা, নিপীড়ন ও আগ্রাসনের কথা। বিশেষ করে সেই তরুণ বয়সে কাপ্তাই বাঁধের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়কর বাস্তবতা তাঁর চিন্তায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। চোখের সামনে জন্মভূমি প্লাবিত হওয়া এবং শত শত বছর ধরে বসবাসরত হাজার হাজার জুম্ম পরিবার স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ও প্রতিবেশী দেশে চলে যেতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তাছাড়া গোটা পাকিস্তান আমলে অস্বাভাবিকভাবে বেআইনী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাও তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি শংকিত হয়ে পড়েন জুম্মদের জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব টিকে থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে। তাই তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় স্বীকৃতি ও অধিকারের কথা তৎকালীন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের নিকট বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল গণপরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আহ্বায়ক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের দাবি জানিয়ে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। এই আবেদনপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত দাবি বলে উল্লেখ করেন এবং নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরেন–

ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে এই রকম শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসনব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঘ) আমাদের জমিস্বত্ব-জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসনব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

উক্ত দাবিসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন– 'পাকিস্তান সরকার আমাদিগকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে। ...রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা আগের মতো পিছিয়ে রয়েছি। এখনও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অর্ধনগ্ন পরিবেশে বাস করছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ আদিম যুগের পরিবেশে বাস করছে।'

বলাবাহুল্য, উক্ত দাবি-দাওয়া ও বক্তব্যে কোথাও তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডের বিপরীত এবং বাঙালি জাতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় উল্লেখ করেননি, বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেননি। অথচ জাত্যাভিমানী শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল বারবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, বাঙালি বিরোধী, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী হিসেবে তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালিয়ে এসেছে।

অথচ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উল্লেখ করেছিলেন– 'এখন নিপীড়নকারী স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার নেই। আমরা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সর্ব রকমের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছি। আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। ...আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাইবোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই।'

বস্তুত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, মানবিক এবং শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন এক বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেছিলেন। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতির পাশাপাশি সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যাবে অন্যান্য সংখ্যালঘু আদিবাসী জাতিসমূহ। ধ্বংসের সম্মুখীন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যাতে সুরক্ষিত থাকে তাই তিনি রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরেছিলেন। এই স্বপ্নই তিনি বারবার ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং বিভিন্ন দাবির মাধ্যমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আর এজন্য তিনি সংসদে ও সংসদের বাইরে গণতান্ত্রিকভাবে এবং পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেসব কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই স্বপ্নই লালন করে গেছেন।

অথচ কী দুঃখজনক, অকৃত্রিম এই দেশপ্রেমিক, মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু, মহান আদর্শবাদী নেতা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও বিপ্লবের মহান পথপ্রদর্শক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে রাষ্ট্র ও বাঙালি জাতির নীতিনির্ধারকরা যেমনি যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি, তেমনি বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরাও তাদের উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতালিপ্সা ও অহংকারে মদমত্ত হয়ে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। বিশেষ করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যখন অত্যন্ত দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মুখ্য বিষয়কে বিবেচনায় না নিয়ে অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে তুলে ধরে এবং তথাকথিত 'দ্রুত নিষ্পত্তি'র নামে অবাস্তবভাবে রাতারাতি অধিকার প্রতিষ্ঠার ধুয়ো তুলে পার্টির মধ্যে বিভেদের সূচনা করে এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে চরম আঘাত হানে। জুম্ম জনগণ হারায় তাদের এক সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ও নির্ভরযোগ্য অভিভাবককে।

গ. প্রাসঙ্গিকতা

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বিশ্বাসঘাতকদের কর্তৃক মহান এই নেতাকে হত্যার পর এবার ২৯ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই দীর্ঘ প্রায় তিন দশকে তাঁকে ভুলে যাওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততই তাঁর চিন্তাধারা, স্বপ্ন ও সংগ্রামী জীবনের ঘটনাবলী এবং ১০ নভেম্বর ঘটনার তাৎপর্য বা শিক্ষা দেশের সচেতন মানুষকে যেমনি, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের অধিকার বঞ্চিত আদিবাসীদের জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গভীর ও নতুনভাবে নাড়া দিয়ে চলেছে। তাঁর চিন্তাধারার যে গভীরতা ও দূরদর্শিতা, সংগ্রামী জীবনের যে অনন্য দৃষ্টান্ত এবং আলোকবর্তিকাসম তাঁর যে ব্যক্তিত্ব তা ক্রমাগত মানুষের মধ্যে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অপরিণামদর্শী হত্যাকারীরা সেদিন নিজেদেরকে যতই বড় ভাবুক, যতই ত্রাণকর্তা মনে করুক না কেন, ইতিহাস কিন্তু তাঁর যথার্থ বিচার করতে ব্যর্থ হয়নি। তারা আজ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। দশই নভেম্বর আমাদের শিক্ষা দেয় প্রকৃত বিপ্লবী ও আদর্শবাদী চেতনার মৃত্যু নেই। জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও সত্যিকারের বিপ্লবী নেতাকে হত্যা করে, দেশের ও দশের কিছু ক্ষতি ডেকে আনা যায় তবে ষড়যন্ত্রকারীদের নিজেদের কবরই খোঁড়া যায়, তবে সেই নেতার চেতনা ও স্বপ্নকে কখনও ধ্বংস করা যায় না। বরং তা প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবিতই হতে থাকে।

মহান নেতার মৃত্যুর পর অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে দায়িত্ব নেন তাঁরই সহোদর, যোগ্য উত্তরসূরী, বিপ্লবী সংগ্রামের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, তার সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম নারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। তাঁর নেতৃত্বে পার্টি অচিরেই সকল ষড়যন্ত্র ও বিভেদের জাল ছিন্ন করে আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং জনগণের মধ্যে আবার ঐক্য-সংহতি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে যেতে সক্ষম হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্টি সরকারের সাথে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরে সক্ষম হয়। বলাবাহুল্য, অনেক রক্ত ও গণহত্যা, অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রম ও অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অধিকারের সনদ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি।

বলাবাহুল্য, কোন চুক্তি সকল সমস্যার সমাধানের গ্যারান্টি দিতে পারে না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দেশের নীতি নির্ধারক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি

সমিতির মধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়। বাস্তবতার নিরিখে এর চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সমঝোতা আর সম্ভব হতো না। বস্তুত চুক্তিটি যে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই যুগের অধিক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার পথ সৃষ্টি করে এবং অধিকার বঞ্চিত আদিবাসী জুম্মসহ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা কোন পক্ষ কর্তৃক অবমূল্যায়ন করার অপচেষ্টার ফলাফল কখনো শুভ হতে পারে না। এটা আজ যেমন সরকারকে, তেমনি ষড়যন্ত্রকারীদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে অবমূল্যায়ন করার অর্থ কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে নয়, উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারের জন্য সংগ্রামরত আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীকে অবমূল্যায়ণ করা, তাঁর দীর্ঘ বছরের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে অবজ্ঞা করা, একটি জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যাকে অবজ্ঞা করা এবং শান্তি-সম্প্রীতির সম্পর্ককে অবমূল্যায়ন করা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোন প্রকার গড়িমসি বা ষড়যন্ত্র কখনও শুভবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক হতে পারে না। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য যেমনি, তেমনি সমগ্র দেশের জন্য কোন শুভ ফল বয়ে আনবে না।

বিগত ১৪ বছরে চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানামুখী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে এবং এখনও প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। সরকারি দলে ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় ও সরকারের বাইরে চুক্তিবিরোধী ও জুম্ম জাতিবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র নানাভাবে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে। গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা তারই এক মহড়া। এখনও প্রতিনিয়ত বহিরাগত বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখলের ঘটনা ঘটে চলেছে এবং জুম্মরা নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। এখনও প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নানাভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ও জাতিগত আগ্রাসনের ঘটনা ঘটে চলেছে। অনেক জায়গায় জুম্মরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে নিজভূমে পরবাসীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এখনও প্রায়ই সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জুম্ম নারীর নিপীড়িত ও ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। জাতিসংঘ, আইএলও কনভেনশন এর সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসী হয়েও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এদেশের আদিবাসী জনগণকে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সংবিধানেও আদিবাসীদের আত্মপরিচয় এর অধিকারকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, চুক্তিবিরোধিতা ও তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নামে নব্য বিভেদপন্থী ইউপিডিএফ বিগত ১৪ বছরে জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় অনেক অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। জুম্ম জাতির অগ্রগতিকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং '৮৩ পরবর্তী জুম্ম জাতিকে আবার ভয়াবহ বিভেদের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হচ্ছে– জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে যে পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছে সেই পার্টির নেতৃত্ব ও সদস্যদের হত্যার মধ্য দিয়ে তারা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে যেমনি নস্যাৎ করতে চেয়েছে, তেমনি জুম্ম জাতির গৌরবময় আন্দোলনকেও কালিমালিপ্ত ও ধ্বংস করতে চেয়েছে। তারা এ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির ৮৬ জন সদস্যসহ তিন শতাধিক নিরীহ জুম্মকে হত্যা করেছে। তাদের এ ভূমিকা ১০ নভেম্বরের ষড়যন্ত্রকারী, বিভেদপন্থী হত্যাকারীদের ভূমিকার সাথেই তুলনা করা চলে।

অপরদিকে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ঠ এক/এগারোর জরুরী অবস্থার সময় ইউপিডিএফ এর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের পাশাপাশি সৃষ্টি হয় আরও এক নতুন ধারার ষড়যন্ত্রের ফসল তথাকথিত পার্টিতে সংস্কার আনয়নের নামে সংস্কারপন্থী চক্র 'জনসংহতি সমিতি (এম এন লারমা)'। যা বিভেদপন্থা ও ষড়যন্ত্রের আরেক নমুনা। এরা চুক্তি বাস্তবায়ন ও জুম্ম জাতির ঐক্যের পক্ষে কথা বললেও বাস্তবে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এর ক্রীড়ণক হয়ে পার্টি, পার্টি নেতৃত্ব, চুক্তি বাস্তবায়ন ও জুম্ম জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তাদের ভূমিকা রেখে চলেছে।

কিন্তু ইতিহাসের কী পরিহাস, যারা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে জাতীয় ঐক্য-সংহতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চুক্তিবিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিভেদের বীজ বপন করে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই নিরস্ত্র জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা ও হত্যার মধ্য দিয়ে হানাহানির জন্ম দেয় তারাই আজ প্রচার করছে যে, তারা ঐক্য চায়, কখনো সখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথাও বলছে। আবার সুযোগ পেলে জনগণকে দেখানোর চেষ্টা থাকে যে, জনসংহতি সমিতি ঐক্য চায় না। অপরদিকে যে সংস্কারপন্থীরা যে মুহূর্তে পার্টির সবচেয়ে ঐক্য দরকার, পার্টির নেতা ও নেতৃত্ব রক্ষা করা দরকার, সেই মুহূর্তেই পার্টির ঐক্য এবং পার্টি ও পার্টি নেতৃত্বের কোমরে ছুরিকাঘাত করেছে, তারাও আজ ঐক্যের কথা বলছে।

কিন্তু তারা যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পার্টি ও জনগণের ঐক্যের বুকে ছুরিকাঘাত করে, তাদের বুক কি তখন একটুও কাঁপেনি, তাদের মাথায় কি এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তার উদয় হয়নি যে, তারা যা করতে যাচ্ছেন তা কী চরম ক্ষতি ডেকে আনতে পারে? এরপর এ পর্যন্ত তাঁরা পার্টির, জুম্ম জাতির ঐক্য ও অধিকারের স্বার্থে তারা যে কুঠারাঘাত করেছেন এবং ক্ষতিসাধন করেছেন, এর জন্য কি তারা কখনও অনুতপ্ত হয়েছেন, সততা ও সৎ সাহসের সাথে আত্মসমালোচনা করেছেন? তাহলে আজকে কেন তাদের এই ঐক্যের হাঁকডাক! তারা ভুল চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে যে ঐতিহাসিক ভুল করে বসেছেন, সেই ভুল শোধরানোর কোন শুভবুদ্ধির উদয় কি জনগণ দাবি করতে পারে না?

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সর্বদা ঐক্যের পক্ষে ছিলেন এবং এজন্য অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন পার্টির ঐক্য রক্ষার জন্য। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিও সবসময় ঐক্যের কথা বলে এসেছে। চুক্তি যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে, সেজন্য জনসংহতি সমিতি সবসময় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছে। বস্তুত জনসংহতি সমিতি সবসময় আদিবাসী জুম্ম জনগণের মধ্যে যেমনি, তেমনি

জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে, সকল নিপীড়িত মানুষের মধ্যে এবং দেশের সকল আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে, আদিবাসী ও বৃহত্তর বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্যের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তাই জনসংহতি সমিতিকে ঐক্যবিরোধী ভূমিকায় তুলে ধরার চেষ্টা ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়।

বলাবাহুল্য, ঐক্য বা জাতীয় ঐক্য কোন কথার কথা নয়, ছেলেখেলা নয় বা শিশুর হাতের কোন মোয়ামুড়িও নয়। বাস্তব দুনিয়ায় নীতি-আদর্শ নিরপেক্ষ, স্বার্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিহীন কোন ঐক্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বাস্তবে সংগ্রাম ছাড়া কোন ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না, এমনকি সেই ঐক্য টিকে থাকতে পারে না। কাজেই যারা নির্বিচারে ঐক্যের কথা উচ্চারণ করেন তা কেবল বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। বস্তুত সেটা ঐক্য নয়, সেটা এক ধরনের সহাবস্থান সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার মধ্যে, সংগ্রামী ও ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে, চুক্তির পক্ষ ও চুক্তির বিপক্ষের মধ্যে, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে সহাবস্থান। বলাবাহুল্য, সত্য সবসময় সরল, অপরদিকে মিথ্যা সবসময় জটিল ও কুটিল। আর ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্বে কোন দল কোন দিয়ে কোন কালেই জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা যায়নি।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার চার দশক পরও বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও শোষণ-বৈষম্যহীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে জুম্ম জনগণসহ আদিবাসী জাতিসমূহের স্বীকৃতি মেলেনি। আজও তারা নানাভাবে শোষণ-বৈষম্য ও নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নির্দেশিত পথ বেয়ে সংগ্রামের এক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আজ ১৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির অধিকাংশ মৌলিক বিষয় এখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আজও চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সুনিশ্চিত হতে পারেনি। ফলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অপরদিকে নব্য বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, পার্টি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত এখনও ১০ নভেম্বরের ঘটনার মত জুম্ম জাতিবিধ্বংসী নীলনকশা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মহান স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের যেমন প্রতিনিয়ত আপোষহীনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, তেমনি সকল প্রকার নব্য বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্যও আমাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই বিভেদপন্থী ও চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করুন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করুন।

এম এন লারমার জীবন ও চিন্তা : বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

॥ প্রফেসর মং সানু চৌধুরী ॥

এম এন লারমার ৭৩তম জন্ম দিবস উপলক্ষে 'এম এন লারমার জীবন ও চিন্তা : বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেওয়ার জন্য যখন আমাকে বলা হলো তখন অনেকগুলো চিন্তা আমার মাথায় এসে ভিড় জমিয়েছিল। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তাঁর জীবনের কোন দিকটির আলোচনা আজকের দিনের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে। হঠাৎ মনে হলো, আমি তাঁকে যেমনটি দেখেছি তাঁরই একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ যদি উপস্থাপন করি তাহলে এম এন লারমার জীবন ও চিন্তার বিষয়ে আজকের শ্রোতৃমণ্ডলী হয়তো বা যৎকিঞ্চিত ধারণা লাভ করতে পারবেন।

> পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ চিত্তকে তিনি যেমন নাড়া দিতে পেরেছেন তেমনি তাদের চিত্তমূলে তিনি প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। ব্যবহারে ও কথাবার্তায় কোমল এমন গোবেচারা মানুষটির মধ্যে যে এমন ইস্পাত দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা থাকতে পারে তা ছিল অভাবনীয়।

যেহেতু তিনি জুম্ম স্বাজাত্যবোধে তাড়িত হয়ে জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আরণ্য জনপদে সংগ্রামের দীপশিখা প্রজ্জ্বলন করেছিলেন, সেই সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের একটি ধারণাও আমাদের থাকা দরকার বলে আমার মনে হয়েছে। তাই ইতিহাসের দিকে একবার ফিরে যেতে চাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশের ঐতিহাসিক দিনক্ষণ নিয়ে হয়তো বা অনেকের মতান্তর থাকতে পারে। কিন্তু আমি ইতিহাসকে যেভাবে দেখি, বৃটিশ বঙ্গে স্বদেশ প্রীতি ও স্বজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটে ১৯ শতকে। ঐতিহাসিকেরা অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমত করেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হলে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি বাংলায় একটি নবজাগরণের ধারা তৈরি হতে থাকে। এই নবজাগরণের ধারা পরে কলেবরপ্রাপ্ত হলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অংশের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের একটি স্বচ্ছ ধারণা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠে। স্বদেশ ও স্ব স্ব সমাজ সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে থাকে। ইংরেজের অত্যাচার ও উৎপীড়নে মানুষ একত্রিত হয়ে দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে মরিয়া হয়ে উঠে। এই সময়ে ইউরোপের রেনেসাঁও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত এ দেশের মানুষের চিন্তার জগতকে আলোড়িত করে তুলেছিল। ক্রমে মানুষ স্বাতন্ত্র্যকামী হয়ে উঠে। এটি ছিল বৃটিশ অধ্যুষিত উপমহাদেশের একটি চিত্র। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা গণভিত্তি পেয়েছে অনেক পরে।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে চাকমা সামন্তপ্রভু জানবক্স খাঁ বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষার জন্য। সেখানে কিন্তু কোন জনসম্পৃক্তি ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাণী কালিন্দী বৃটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন চাকমা রাজের স্বতন্ত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে। এখানেও লড়াইটা হয়েছে রাজায় রাজায়, জনগণ সে লড়াইয়ে সামিল ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার প্রাক্কালে এই দেশ বিভক্তিকে কেন্দ্র করে আবারও একবার এই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে দোলাচল দেখা দেয়। রাজনীতির এই দোলাচলে মূলত জুম্ম ছাত্রদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা আন্দোলনের গতিবিধি নির্ধারণে ব্যর্থ হলেন। ছাত্র সমাজের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাতন্ত্র্যের যে চেতনা সেটা সুপ্ত থেকে গেল। গত শতকের ৫০ এর দশকে আবারও একবার জুম্ম ছাত্র সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র মর্যাদার তাগিদকে অগ্রসরমান করার জন্য সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৬০ এর দশকের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাতে জুম্ম ছাত্র সমাজের সেই প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটি ছিল সাময়িককালের জন্য। মূলত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও এই প্রকল্প সৃষ্ট অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয় জুম্ম জনগণের বিশেষ করে জুম্ম ছাত্র সমাজের মধ্যে জুম্ম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্রেরণাকে শতগুণে উজ্জীবিত করে তোলে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিপর্যয়ই মূলত জুম্ম জাতীয়তাবাদের চেতনাকে সংহত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। তবে সেটি ছিল অঘোষিত। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তিকালে রাঙ্গামাটিতে ডেপুটি কমিশনারের বাসভবনে পার্বত্য চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনার অবতাড়না হয়েছিল তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাকিস্তান সরকার আদাজল খেয়ে লেগেছিল। কিন্তু বহমান নদীর স্রোতকে তো আর আটকে রাখা যায় না। কাপ্তাই বাঁধের বিপর্যয় জুম্ম জনগোষ্ঠীর বুকে যে ক্ষোভ আর বঞ্চনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তা তো আর নেভার নয়। এই ক্ষোভ, উপেক্ষা, অবহেলা এবং বঞ্চনার বেদনা কিন্তু একটি মানুষের মনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। তিনি স্থির করলেন এর প্রতিবাদ করতে হবে। আর কতকাল এভাবে পড়ে থেকে বারবার মুখ বুজে সহ্য করা যায়। তিনি কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে একটি প্রচারপত্র ছাড়লেন।

রাজনীতি নিষিদ্ধ অঞ্চল, অথচ তার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এমন একটি বক্তব্য রাষ্ট্রপক্ষের জন্য ছিল অভাবনীয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে এমন প্রবল প্রতিবাদ সে যুগে অন্য কারোর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ এমন শান্ত অঞ্চলের, আরও শান্ত মানুষের মধ্য থেকে এমন প্রতিবাদী আওয়াজ শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষাবধি সরকার আতঙ্কিত হয়ে কাল বিলম্ব না করে তাকে কারারুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এই ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

আমি মনে করি, সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনীতিকে কেউ যদি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন তিনি হলেন একমাত্র এম এন লারমা। সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তিনি জুম্ম জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ও কল্যাণ কামনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নিষিদ্ধ রাজনীতিকে অর্গলমুক্ত করেছিলেন। সব ধরণের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে স্বাজাত্যবোধকে ধারণ করার জন্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও অধিকারের আন্দোলনে তিনি জুম্ম জনগোষ্ঠীকে জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও জাগরণে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। যে জাতীয়তাবাদের জাগরণ প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলস কর্মী ছিলেন, সে জাতীয়তাবাদে কোন সহিংসতার, কোন উগ্রতার স্থান ছিল না, সাম্প্রদায়িকতার কোন গন্ধ ছিল না। জুম্ম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তিনি জুম্ম জাতির হারানো অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাদের তিনি অধিকার আদায়ের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পার্বত্য আদিবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের সবাইকে সংগ্রামী ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে একজন শক্তিমান সংগঠক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদের ডাক দিয়ে তিনি তরুণ সমাজকে উজ্জীবিত করেছেন। অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পক্ষে তিনি প্রবল এক উন্মাদনায় ও উদ্দীপনায় এখানকার মানুষদের সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এখানকার নির্মল প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠা সহজ-সরল নির্বিরোধী মানুষদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের একশ্রেণীর ক্ষমতাবান লুটেরাদের যোগসাজসে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন এবং সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সব সহজ-সরল, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে এম এন লারমার উত্থান যেন ইতিহাস নির্ধারিত ছিল। আর তা যদি না হতো তাহলে কাপ্তাই বাঁধের ক্ষত তো আরও সহস্র জনের বুকে ক্ষোভ ও যন্ত্রণা হয়ে বিঁধে ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের প্রতি মদমত্ত সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা, লাঞ্ছনা এবং অপমান অন্যদের বুকেও তো পুঞ্জিভুত অপমান ফেনিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ঐ যুগ-বেদনার উন্মাদনাকে গভীরভাবে অন্তরে উপলব্ধি করে তাঁর মত অন্য কেউ তো সোচ্চার, সরব ও উচ্চকণ্ঠ হননি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারকামী ও অধিকার সচেতন আদিবাসী তরুণদের কাছে এম এন লারমা আদর্শস্থানীয় হতে পেরেছেন।

প্রয়াত এম এন লারমার মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত একজন সংগ্রামী নেতার গুণাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করি। জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং লক্ষ্য অর্জনে তাঁর একাগ্রতা ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ ছিল অতুলনীয়। রাজনীতি, সমাজনীতি ও স্বাধিকার আন্দোলনের বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণী ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় আমি চমৎকৃত হতাম। বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় হয়ত তিনি কিছুটা বেশি সময় নিতেন, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া পদ্ধতিগত হওয়ায় তিনি প্রায়ই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন। আর সে কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাঁরই নেতৃত্বে অনুসৃত নির্ভুল নীতি ও কৌশলের বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারকামী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বুকে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল।

এম এন লারমা সকল ধরনের দীনতা, হীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে আমরা সত্য, ন্যায় ও অধিকারের জয়গান শুনেছি। অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের সঙ্গে তিনি কখনই আপোষ করেননি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ চিত্তকে তিনি যেমন নাড়া দিতে পেরেছেন তেমনি তাদের চিত্তমূলে তিনি প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। ব্যবহারে ও কথাবার্তায় কোমল এমন গোবেচারা মানুষটির মধ্যে যে এমন ইস্পাত দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা থাকতে পারে তা ছিল অভাবনীয়। কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িত থাকবেন না এমন মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে আসার সরকারের প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাম্যের পুজারী। সাম্যবাদের আদর্শে দীক্ষিত এই মানুষটি অন্যায়, অবিচারে নিপীড়িত মানুষের পুঞ্জিভূত বেদনাকে বুকে ধারণ করে তাদের মুক্তির জন্য অগ্নিবীনা হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

মানুষের দুর্দশায় তিনি বিচলিত হতেন। দরিদ্র মানুষদের জীবন যন্ত্রণায় তিনি পীড়িত বোধ করতেন। একদিন এক দরিদ্র জুমিয়া

প্রায় অর্ধনগ্ন কাপড়ে থুরুং ভর্তি জুমের শাক-শবজি নিয়ে তাঁর বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তখন এমপি ছিলেন। এমপি মহোদয়ের কাছে তার কোন না কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। শাক-শবজিগুলো নিয়ে এসেছিলেন এমপি মহোদয়কে ভ্যাট দেওয়ার জন্য। এমপি মহোদয় তাঁর কাজ করে দিলেন, কিন্তু ভ্যাট নিতে রাজি হলেন না। তবে এক শর্তে রাজি, লোকটিকে ঐসব জিনিসের দাম নিতে হবে। নতুবা জিনিস ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু অত ভারী বোঝা তো আর অত দূরে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অগত্যা জুমিয়াকে দামই নিতে হলো।

এম এন লারমার সততা কিংবদন্তীতুল্য ছিল। তিনি দু' দু'বার সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোন অন্যায় সুবিধা তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত অনেকগুলো সুবিধা তিনি গ্রহণই করতেন না। নিজে সৎ ছিলেন, অন্যকেও সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন। মানুষের অসততা ও মিথ্যাচারে তিনি বেদনাহত হতেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও নিরাভরণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর ছিল এক জোড়া খাকী ট্রাউজার, আর এক জোড়া সাদা শার্ট। তাও ছিল সূতির। খুবই অল্প দামের। নিজে কাপড় ধুতেন, ইস্তিরি করতেন না, ভাজ করে বালিশের নিচে রেখে পরে ওটাই গায়ে দিতেন। পায়ে কোন দামী জুতা ছিল না। তখনকার দিনে খুব সম্ভবত পাঁচ/ছয় টাকা দামের প্লাস্টিকের যে জুতা পাওয়া যেত, সেটাই তিনি সবসময় ব্যবহার করতেন। কোন প্রসাধন সামগ্রীই তিনি ব্যবহার করতেন না। অথচ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতেন।

তিনি যে একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন তা তার পোশাকে-আশাকে বোঝা যেত না। ব্যক্তিগত সুখ-বিলাসিতাকে বিসর্জন দিয়ে, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি জুম্ম জাতির জীবনকে সুন্দর ও নিরাপদ করার ব্রতকে ধারণ করেছিলেন। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, তাঁর ঘরের মেঝে ছিল কাঁচা। মাটির। শোয়ার জন্য তাঁর কোন খাট ছিল না। মাটিতেই তিনি মাদুর পেতে শুতেন। বৈঠক খানায় তাঁর কোন আসবাবপত্র ছিল না। খুব কম দামের দু'একখানা চেয়ার ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন সৎ, নির্মোহ, নির্লোভ মানুষটিকে আমরা খুব অল্প সময়ে হারিয়েছি।

এম এন লারমা সত্যের দুর্গম পথের যাত্রী হিসেবে জুম্ম জাতি, অধিকারকামী, সংগ্রামী মানুষদের বীর্যদীপ্ত মহান ত্যাগের পথে আগুয়ান হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য লাঞ্ছিত, ইতিহাস উপেক্ষিত ও বঞ্চিত মানুষদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্নকে তিনি তাঁর ভাবে, কল্পনায় ও চিন্তায় লালন করেছিলেন। তাঁর সমগ্র কর্মযজ্ঞের লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা। তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কারণে তিনি পার্বত্য আদিবাসীদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। আমাদের মধ্যে আজ যে মর্যাদাবোধ জেগেছে তাঁর মূলে রয়েছেন এম এন লারমা। অথচ তাঁর এত জনপ্রিয়তার পরেও তিনি অধিকারের রাজনীতির নামে জনগণের উপর কোন ধরনের ক্লেশকর দাবি বা চাপ সৃষ্টি সমর্থন করেননি। এ ধরনের কর্মকৌশলকে তিনি ঘৃণা করতেন। কোন জোর-জবরদস্তি নয়, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও মানুষের চিত্ত জয়ের মাধ্যমে তিনি সকলের মাঝে স্থান করে নিতে চেয়েছিলেন। এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির ভাগ্যাকাশে 'ঝরের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে/অট্টহাস্যে আকাশখানি ফেরে' আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানকার অধিকার বঞ্চিত মানুষদের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের বেদিতে তিনি নিজেকে নৈবেদ্য হিসেবে সমর্পন করেছেন এবং আত্মাহুতি দিয়েছেন। তাঁর এই কর্মকে আমরা অমৃতাঞ্জলি হিসেবে বরণ করেছি। এই অসামান্য ত্যাগ তাঁকে এবং তাঁর আরও সেই সব নিবেদিত সহযোদ্ধাদের যাঁরা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন তাঁদের জুম্ম জাতি ও উত্তরসূরীদের কাছে কালজয়ী করে রাখবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস

॥ এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ॥

আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মান্যবর প্রধান অতিথি, সম্মানিত প্রধান আলোচক, উপস্থিত সুধীমন্ডলী ভাই ও বোনেরা। শহীদ মানবেন্দ্র নারাযণ লারমার ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে আজ সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি। একদিকে দিনটি আমাদের সবার জন্যে আনন্দের, অন্যদিকে শোকেরও। শোকাবহ এই জন্যে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের লড়াই করতে গিয়ে তিনি আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে বিভেদপন্থী চক্রান্তে শহীদ হয়েছেন। তাঁর এই শাহদাৎ বরণ পরবর্তীতে শোককে শক্তিতে পরিণত করেছে। সেদিক থেকে বলতে চাই এম এন লারমার আজকের এই জন্ম দিবস মানবাধিকারের চেতনায় নিজেদের উজ্জীবিত করার জন্য। সাম্য-সমতা, মানবিক মর্যাদা, যা সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। যতদিন পর্যন্ত না তা প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন পর্যন্ত শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনকে অভিনন্দন, আজকের এই মহতি সমাবেশে উপস্থিতির সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে। সম্মানিত অভ্যাগতবৃন্দ আপনাদেরকে জানাই সশ্রদ্ধ লাল সালাম। আমি আমার জীবনে তিন পর্বে খুব কাছে থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দেখেছি। ষাট-এর দশকে তিনি যখন চট্টগ্রাম কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। সত্তর-এর দশকের সূচনায় যখন তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিজ্ঞ সাংসদ হিসেবে জনপ্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আর সবশেষে তাঁকে দেখতে পাই ৭৫-এর পরবর্তী পার্বত্য ভূমির জনগণের স্বার্থে অধিকারের লড়াই করতে গিয়ে তিনি যখন আত্মগোপনে ছিলেন। আজকের এই দিনে বড় বেশী করে তাঁকে মনে পড়ছে।

ষাটের দশকে চট্টগ্রাম কারাগারে কিছুদিনের জন্যে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দেখেছি, তবে সেদিন পরিচয় ঘটেনি। সেই কিশোর বয়সে কেন তিনি কারা অন্তরালে কাটিয়েছেন তা বোঝার সুযোগ ঘটেনি। তবে পরবর্তীতে জেনেছিলাম আমার মেসো মশাই প্রখ্যাত রাজনীতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কাছ থেকে। প্রয়াত কমরেড দস্তিদার তাঁর জীবনের ৬৮ বছরের মধ্যে ৩১ বছর কখনও বৃটিশের, কখনও পাকিস্তানের জেলে কাটিয়েছেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার এক পর্যায়ে তিনি শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মুক্তির জন্যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে এ্যাডভোকেট লুৎফুর হক মজুমদারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় তৎকালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি পাওয়ার পর শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল চট্টগ্রামের জেএম সেন হলে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম জেলা কমিটি এই সংবর্ধনার উদ্যোগ নিয়েছিল। পূর্ণেন্দু দস্তিদার সেই সংবর্ধনা সভার অতিথি বক্তা ছিলেন। তাঁর মুখে শুনছিলাম বাষট্টিতে কাপ্তাই হ্রদ বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে পাহাড়ি জনজীবনে যে বিপর্যয় ঘটল তা গভীরভাবে ভাবিত করেছিল যুবক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। সেই ভাবনা থেকে তাঁর চিঠি চালাচালি গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে পারেনি। বিপত্তিটি ঘটেছিল সেখানেই। পাকিস্তান সরকারের আটকাদেশে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দীর্ঘকাল কারা অভ্যন্তরে কাটিয়েছিলেন। সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজকদের মধ্যে আমি সেদিন একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলাম। পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক স্বৈরশাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে পাহাড়ি-বাঙালি জনগণের অব্যাহত লড়াই-সংগ্রাম ৭১-এ এক মোহনায় মিলিত হয়ে যায়। আর তা হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রাক্কালে ঘোষিত স্বাধীনতা সনদে গোটা জাতিকে স্বপ্ন দেখানো হলো- অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি, শৃংখলিত জীবন থেকে স্বাধীনতা, অবাধ বিকাশের সুযোগ আর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সর্বক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা। এ আশায় দৃঢ় হলো বাঙালি-পাহাড়ির ঐক্য আর মেলবন্ধন। আর তারই চুড়ান্ত পরিণতিতে ঘটলো '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনগণের বিজয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ধর্মীয় জাত্যাভিমানের শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী 'সকল নাগরিকের বাংলাদেশ' এই বীজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেলো ঠিক, কিন্তু ভাষাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালির জাত্যাভিমানের কাছে অপরাপর ভাষাভাষিগোষ্ঠী আবার শৃঙ্খলিত হয়ে যায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। বলার চেষ্টা করেছেন স্বাধীনতার পর সংসদে, রাজপথে। আমরা ভাষাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাষা বুঝার চেষ্টা করিনি, বুঝতেও চায়নি। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোড়ে সেই ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। নানান মিথ্যা অপবাদে, ধুম্রজাল সৃষ্টি করে একদিকে বাঙালি জনগণ স্বার্থ উদ্ধার করেছি অন্যদিকে উপনিবেশিক আমলের মত পাহাড়ি জনগণকে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শাসন-শোষণের আওতায় আমরা কয়েদ করেছি। এক পর্যায়ে পাহাড় ভূমির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত

করার নির্মম খেলাও আমরা খেলেছি। কিন্তু এর ফল যে শুভ হয়নি তা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। গণতন্ত্র মানেই এক ব্যক্তির এক ভোট নয়, গণতন্ত্র মানেই জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষের সমান অধিকার ও সমসুযোগের নিশ্চয়তা। কিন্তু রাষ্ট্র যখনি তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে, হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে, প্রকৃত গণতন্ত্রকামী, স্বাধীনতা প্রিয় নেতা হিসেবে তার উদ্যোগে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পাহাড়ি জনগণের প্রাণের দাবিতে উচ্চকিত হয়েছেন। বাঙালি-পাহাড়ির ঐক্যবদ্ধ মেলবন্ধনের মধ্যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা সুস্পষ্টভাবে সেদিন তুলে ধরেছিলেন তিনি। নিয়তির নিথুর পরিহাস বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক লড়াইকে আমরা অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস বলে জনগণের ন্যায্য দাবিকে অস্ত্র দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া যায় না। বরং তা অশান্তি-অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতার বাতাবরণ তৈরি করে। আমরা জেনে শুনে ইতিহাস থেকে পাঠ করতে চাই না, শিক্ষাও নিতে চাই বলে মনে হয় না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। কনসেশন দিতে হয়নি আপামর বাংলাদেশের জনগণকে। পাহাড়ে শান্তির বাতাবরণ নষ্ট করলো যারা শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই শান্তির অন্বেষায় চষে বেড়াতে হলো। এরশাদ, খালেদা থেকে শেখ হাসিনার সরকারের আমলে সম্পাদিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। যেই চুক্তি আন্তর্জাতিক মর্যাদাও পেয়েছে। এই চুক্তির পরতে পরতে শহীদ এম এন লারমার ছোঁয়া, তাঁর আন্দোলনের ন্যায্যতার স্বীকৃতি আছে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চিরকালের জন্যে অমর হয়ে রইলেন, শুধু পাহাড়ি জনগণ বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে নয়, মানবাধিকারকামী বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে।

আজকের এই দিনে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলতে চাই শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশে মানবাধিকার আন্দোলনের জনক। এ আন্দোলনের মধ্যে তিনি শহীদের মর্যাদাও অর্জন করেছেন। আজ এ আন্দোলন সমতলের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, উৎসাহিত করেছে। মানবাধিকারের আন্দোলন আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শাহাদাৎ প্রাপ্তির পর তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়ে নির্ভীকতার সাথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন, এগিয়ে চলেছেন তাঁর অনুজ শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সন্তু লারমা নামে যিনি সমধিক পরিচিত দেশে বিদেশে সর্বত্রই। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নে তাঁর নির্ভীক পদক্ষেপ, পদচারণা গোটা জাতি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামে তিনি আজ একা নন, গোটা দেশ ও জাতিকে তিনি একাত্ম করেছেন। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা, বলিষ্টতা। চক্রান্ত কম হয়নি, কিন্তু সকল কুটিল চক্রান্তকে প্রতিরোধ করে পাহাড়ি জনগণের দাবি আদায়ে তিনি হলেন সময়ের সাহসী সৈনিক। আজও যার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের আপামর জনগণের কাছে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে সমাদৃত, শ্রদ্ধেয়। সংবিধান সংশোধনকালে দেশবাসীর দাবি ছিল আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু কোন এক রহস্যজনক কারণে এ দাবি আজও পূরিত হলো না। অনেকে আমরা এ রহস্যজনক কারণকে জানি।

আদিবাসীদের পরিচয় দেওয়া হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে, উপজাতি হিসেবে। অথচ আদিবাসীরা বাঙালিদের উপজাতি নন, আর বাঙালিও যদি একটি নৃগোষ্ঠী হয় তবে আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে বৃহৎ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীতে কি পৃথক করা হলো না? এ কথাটি সত্যি, এ ধরনের যে কোন বিভাজনমূলক প্রক্রিয়া থেকে উত্তরণের জন্যে তো হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ পরিস্থিতিতে আদিবাসীদের আদিবাসী পরিচয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতিদানের দাবিকে অধিকতর জোরদার করা আজ সময়ের ঐকান্তিক দাবি। মনে রাখতে হবে, তা '৭৩-এর আগে বলেছিলেন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আজ তা শতকণ্ঠের দাবিতে, হাজারো কণ্ঠের দাবিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালি-পাহাড়ি নির্বিশেষে আজ সবাই এ দাবিতে সোচ্চার। বর্তমান সরকারের মেয়াদকাল শেষ হতে আর বেশি দিন সময় নেই। সামনে বছরের অক্টোবর পর্যন্ত এ সরকারের মেয়াদ রয়েছে। বিগত ২০০৮ সালে নির্বাচনের আগে মহাজোট সরকারের নেতৃত্বাধীন দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ তার ঘোষিত নির্বাচনী ইসতেহারে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করে। সে অঙ্গীকারের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন আজো হয়নি।

এ ব্যাপারে সরকারের উর্ধ্বতন মহল থেকে ইদানিং কালের বেশ কিছু ঘোষণায় মাঝে মাঝে আশাবাদের সৃষ্টি হলেও তা নিরাশায় পরিণত হতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। বাঙালি-পাহাড়ি নির্বিশেষে মানবাধিকারকামী সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্যে এতে অস্বস্তি ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। অনতিবিলম্বে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়ে সরকার তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দেবে এইটি প্রত্যাশা। নচেৎ এ খেসারতের জন্যে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে শুভ ফল বইয়ে আনবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ভূমি কমিশন আইনের যথাযথ সংশোধনের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে পাহাড়ি জনগণকে? পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আজকের প্রধান অতিথি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা একজন। আর একপক্ষ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই সরকারের পক্ষে যিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তিনি আজকেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসীন। তাই সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রণী ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে জাতি গভীরভাবে প্রত্যাশা করছে। এবারেও এই প্রত্যাশা পূরণ না হলে তা পার্বত্য ভূমিতে আবারো অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে পারে, যা কোনভাবেই কাম্য নয় এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের পক্ষে গোটা বাংলাদেশের যে জনগোষ্ঠী রয়েছে সে জনগোষ্ঠীরও কাম্য নয়। কেননা গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আজ আমাদের আজকের দিনের এই মুহূর্তে সবাইয়ের কাম্য।

এম এন লারমার আত্মত্যাগ, বিভেদপন্থী চক্রান্ত এবং আমাদের করণীয়

॥ সমীচিন চাকমা ॥

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে পৃথিবী জুড়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য, ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ঢেউয়ের উত্তাল হাওয়া, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও প্রভাব- এম এন লারমার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে রেখাপাত করে থাকে। তখন 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি চরম অনাস্থা পুঞ্জিভূত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। হৃদয়ের গভীরে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিন্তু তখনকার সময়ে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ছিলেন অঘোর ঘুমে নিমগ্ন। অন্ধকার ছিল জুম্ম জাতীয় জীবনে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা তথা সর্বক্ষেত্রে অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব ক'টি জাতিগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা-বিক্ষিপ্ততা ও অনৈক্যের বাস্তবতা তাঁর হৃদয়ে পীড়া দিত।

১৯৭১ সালে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধে জুম্ম যুবকদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেন। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের বিরোধিতার কারণে তাঁর এ উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯৬০ সালে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, স্বৈরাচারী পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সরকার ভারত থেকে আগত মুসলমান পরিবারগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বসতি প্রদান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি জুম্ম জাতিসত্তা নিশ্চিহ্নকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। শাসকগোষ্ঠী এসব জাতিগত নিশ্চিহ্নতরণের ঘটনা তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে আত্মমুখী সামন্তীয় চিন্তা ও চেতনায় আচ্ছন্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি অন্যদিকে জাতিগতভাবে ধ্বংস করার পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র মহান নেতা এম এন লারমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ফলে ছাত্র অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের এই জুলুম-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন এই অকুতোভয় যুবক এম এন লারমা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগণের পক্ষে এম এন লারমার প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করলো না; পক্ষান্তরে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে। প্রায় ৩ বছর কারাবাসের পর ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ চট্টগ্রাম কারাগার থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

তিনি সব সময় শিক্ষিত ও সচেতন যুবসমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘুমন্ত জুম্ম সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার আহ্বান জানালেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সচেতন শিক্ষিত যুব সমাজের একাংশ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। শোনাতে লাগলেন ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে ঘুম জাগানিয়ার অগ্নিমন্ত্র। এক পর্যায়ে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল যুবসমাজের সাংগঠনিক তৎপরতায় ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

১৯৭১ সালে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধে জুম্ম যুবকদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেন। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের বিরোধীতার কারণে তাঁর এ উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের যুবসমাজের প্রগতিশীল অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনেকে শহীদ হন। স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। ১৯৭২ সাল ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমা তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের দাবির আবেদনপত্র নামের ৪ (চার) দফা সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামা পেশ করেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের সেই প্রাণের দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

এরপর আসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭৩ সনে সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে এম এন লারমা এবং দক্ষিণাঞ্চলে চাথোয়াই রোয়াজা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। এম এন লারমা ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করে জুম্ম জনগণকে একই রাজনৈতিক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য একদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্রতী ছিলেন অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল রাস্তা রুদ্ধ হলে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। প্রয়াত এম এন লারমা এবং তাঁর সহোদর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা নিরলসভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অবস্থানরত জুম্ম জনগণকে সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে গেছেন। এ সংগঠনের কাজে বিশেষ করে তাদের দুই জনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ ও সারাদেশের সামাজিক অবস্থানের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেন। এম এন লারমার সেই বিশ্লেষণ ও দিকনির্দেশনা এখনো প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য।

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে প্রয়াত নেতা এম এন লারমা বাকশালে যোগ দেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হলে দেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটে। এতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হলে মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং খুব দক্ষতার সাথে এ সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনা করেন।

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন ডাকাত ও সশস্ত্র দলের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে বান্দরবানের দিকে বামাএগাতা, রামগড়ে আবদুল হকের নেতত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, এমএনএফ, যুবসংঘ, টিপিপি, সর্বহারা পার্টি। তৎসময়ে এ দলগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অনেক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই এ দলগুলি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মূল আন্দোলনে হাত দেওয়া ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাই ১৯৭৬ সালের মধ্যে সেসব দলের কার্যক্রম নির্মূলীকরণের কাজ জনসংহতি সমিতিকে চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ডাকাত দলসহ সশস্ত্র দলগুলোকে নির্মূলকরণের মধ্য দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল বলে তখন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির গঠিত সশস্ত্র বাহিনীকে 'শান্তিবাহিনী' নামে আখ্যায়িত করেছিল।

পার্টির কাজ জোরেসোরে চলতে লাগল। জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে থাকে। প্রতিটি গ্রামে গড়ে উঠেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত ও যুব সমিতি। গড়ে উঠেছিল গণলাইন। যার কারণে শান্তিবাহিনীর নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় তৈরি হয়েছিল। জুম্মদের মধ্যে অল্প কিছু অংশ বিশেষতঃ সমাজের সেই একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল, সুবিধাবাদী গোষ্ঠী, সরকারি দালাল, সরকারি গুপ্তচরের অস্তিত্ব দেখা দেয়। তাদের কার্যকলাপের কারণে পার্টির অনেক ক্ষতিও হয়েছে। সবচেয়ে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে ১৯৮৩ সালের সেই ১০ নভেম্বর। সেদিন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু, জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ তাঁর ৮ (আট) জন সহযোদ্ধাকে বিভেদপন্থীদের অতর্কিত সশস্ত্র আক্রমণে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

> আর বিভেদপন্থার সর্বশেষ সংস্করণ রূপায়ণ-সুধাসিন্ধু-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত আদর্শচ্যুত স্বার্থান্বেষী কতিপয় সদস্য জনগণকে বিভ্রান্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য পার্টির দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনী বরাবরই ছিল ঐক্যের পক্ষে এবং বিভেদপন্থা ও উপদলীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে। তাই 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে যখন সমঝোতা সম্পাদিত হয় তখন কর্মীবাহিনী খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠে। ঐক্যবদ্ধভাবে আবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু তাদের সেই ঐক্যের স্বপ্ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সমঝোতার আবেগে ভাসতে না ভাসতে কর্মীবাহিনীকে হতবাক করে দেয় ১০ই নভেম্বরের রক্তাক্ত বন্যা। তা সত্ত্বেও পার্টির মহান নেতা এম এন লারমার মৃত্যুর পর জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ধ্বংসপ্রায় জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনের হাল ধরেন। তাঁর নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতিতে আরো ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্চার হতে থাকে। খুবই দক্ষতার সাথে তিনি আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলেন। এক পর্যায়ে দুর্বার আন্দোলনের মুখে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'তে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের আগে থেকেই সেই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও উচ্চাভিলাষী চক্র নতুন

রূপে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সমঝোতা বিরোধিতা করতে শুরু করে। তারা পরবর্তীতে ইউপিডিএফ নামে একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন গঠন করে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে 'কালো চুক্তি' আখ্যা দিয়ে চুক্তিকে বিরোধীতা করে আসছে। সেই গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মত জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে যে- তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে মানে না, মানবে না এবং তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর আজ ১৪ বৎসর অতিবাহিত হতে চলেছে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায়ের নামে তারা প্রত্যাগত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সদস্যদেরকে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে চলেছে। আজ পর্যন্ত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ৮৬ জন প্রত্যাগত জেএসএস সদস্যসহ তিন শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

তাদের কাজ হচ্ছে- সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া, মুক্তিপণ আদায় করা, চাঁদাবাজীসহ প্রত্যাগত জেএসএস সদস্যদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা। তাদের এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে পার্বত্য এলাকার জুম্ম জনগণ বর্তমানে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং জিম্মি হয়ে পড়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মোটা অংকের অর্থ আদায় করাসহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রত্যেক চেয়ারম্যান-মেম্বার পদপ্রার্থী থেকে মনোনয়নের জন্য তারা হাজার হাজার টাকা আদায় করে নেয়। কিন্তু নির্বাচনের সময় এক ইউনিয়ন থেকে মাত্র একজনকে চেয়ারম্যান পদে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে মাত্র একজনকে মেম্বার পদে মনোনয়ন দেয় জাতীয় সংসদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ও প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বলপ্রয়োগ করে তাদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করে থাকে। নিরীহ জুমচাষীদের জুমচাষ করতে না দেয়া ও নির্যাতন করা, ইউপি নির্বাচনে অবাধে নির্বাচন করতে না দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করা, রাবার বাগান কেটে দেয়া, কতিপয় জায়গায় বাজার বয়কট ও গাছ-বাঁশের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জনের হঠকারী কর্মসূচি, তাদের ডাকা সমাবেশে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকে বাধ্যগতভাবে লোক অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা, আদা-হলুদ-কলা থেকে শুরু করে কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য থেকে জোরপূর্বক টোল আদায় করা, বিচারের নামে হাজার হাজার টাকার জরিমানা আদায় করা ইত্যাদি গণ-বিরোধী কার্যকলাপের ফলে তারা বর্তমানে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা।

২০০৭ সালের ওয়ান-ইলাভেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে থাকে। দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ফাটল সৃষ্টি হয়। সেনাশাসনে কেউ গ্রেফতারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, কেউ দালালীপনা করতে গিয়ে নিজ দলের সঙ্গে বিরোধীতা করে ও উপদলীয় চক্রান্তের ষড়যন্ত্র শুরু করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যেও তাই ঘটেছে। নিজ দলীয় সভাপতির বিরুদ্ধে পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তুলে ধরে কতিপয় কর্মীকে বিভ্রান্ত করে 'সংস্কারপন্থী' নামে উপদলীয় চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ে পার্টির সিনিয়র কর্মী রূপায়ণ-চন্দ্র শেখর-সুধাসিন্ধু-তাতিন্দ্র লালের নেতৃত্বাধীন এক চক্র। তারা আরো সুর মিলায় ইউপিডিএফ এর সাথে। এক সময় যারা তাদের অন্যতম শত্রু ছিল। এখন তারা এক টেবিলে বসে বৈঠক, পরিকল্পনা, খাওয়া-দাওয়াসহ সব কিছু করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিভেদ কেন? সুতরাং বলা যেতে পারে, ১৯৮৩ সনের সেই জাতীয় বেঈমান, বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের প্রেতাত্মা হয়ে তারা কি আরো নতুন ১০ নভেম্বর সৃষ্টি করতে চান?

সম্প্রতি আরো দেখা যাচ্ছে যে, ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেছে। জনসংহতি সমিতির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করার কথা বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় বুদ্ধিজীবী তথা নাগরিক সমাজের লোকজনকে ধরে জনসংহতি সমিতির কাছে ঐক্যের প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের উপর ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে। তাছাড়াও সমিতির সিনিয়র কর্মীদের মৃত্যুর হুমকিও পাঠাচ্ছে। তাদের এ স্ববিরোধী কার্যকলাপ আর কতদিন চলবে? তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে যে কোন বিভেদ বা বিরোধ মীমাংসার জন্য তবুও জনসংহতি সমিতি গোড়া থেকেই নিরসনের জন্য সকল প্রকার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। সেজন্য ইউপিডিএফের সাথেও সমঝোতার জন্য দফায় দফায় বৈঠকও করেছে এবং সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষর করে। কিন্তু ইউপিডিএফ বরাবরই ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নিয়ে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই মারণাস্ত্রের ঝনঝনানি চলতে থাকলে কি ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব? তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম ও অস্ত্রসম্ভার আগে পরিত্যাগ করতে হবে; তবেই বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে চলছে এক কঠিন সংকট। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে নস্যাৎ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম বর্তমানে অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অপরদিকে জাতীয় জীবনে চলছে আরেক আভ্যন্তরীণ সংকট। '৮৩-এর সেই বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো বিভেদপন্থা গ্রহণ করে ইউপিডিএফ চক্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ জুম্মদের অপহরণ, হত্যা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অবতারনা করেছে এই অনাকাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংকট। আর বিভেদপন্থার সর্বশেষ সংস্করণ রূপায়ণ-সুধাসিন্ধু-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত আদর্শচ্যুত স্বার্থান্বেষী কতিপয় সদস্য জনগণকে বিভ্রান্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এমনিতর এক কঠিন পরিস্থিতিতে ১০ই নভেম্বরের চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়ে সকল প্রকার বিভেদপন্থী চক্রান্ত মোকাবেলা ও নির্মূল করা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। তাই সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইস্পাত-কঠিন জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে হবে।

বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্র, সংঘাত ও জেএসএস-ইউপিডিএফ সমঝোতা

॥ উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মেহনতি মানুষের কণ্ঠস্বর, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২৯তম শাহাদাৎবরণের দিন। এই দিনে ২৯ বছর আগে বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার হয়ে ৮ জন সহযোদ্ধাসহ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন। এ ঘটনা বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের মুক্তিকামী গণমানুষকে। ক্ষমতা লিপ্সায় মদমত্ত হয়ে সর্বোপরি আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের খপ্পড়ে পড়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র পার্টির মধ্যে বিভেদপন্থা ও উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করেও বিভেদপন্থী ও তাদের দোসরদের সেই হীন আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হয়নি। গৃহযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর পার্টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আন্দোলনের গতি দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এক পর্যায়ে সরকার ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে ইউপিডিএফ নামধারী আরেক নব্য বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীর উত্থান ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে কেন্দ্র করে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ ১৪ বছর ধরে জুম্মদের উপর বিভেদ, হানাহানি, সংঘাত ও সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়েছে। তারাও '৮৩-এর ১০ই নভেম্বরের মত আরেক শোকবহ দিন সৃষ্টির মরিয়া অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এলক্ষ্যে তারা এম এন লারমার ছোট ভাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি ও দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সেই সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন, যারা বিগত ১৪ বছর ধরে বিভেদ-সন্ত্রাস-সংঘাত চাপিয়ে দিয়ে জুম্ম জনগণের জনজীবনকে হাঁফিয়ে তুলেছে সেই ইউপিডিএফ বিভেদকামীরাই জেএসএস-ইউপিডিএফের সমঝোতা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। নিজেদের অপকর্মকে ধামাচাপা দিতে ইউপিডিএফ বরাবরই প্রচার করেছে যে, জেএসএস, বিশেষ করে জেএসএসের সভাপতি সন্তু লারমা সমঝোতা চান না। আর এ জন্যই জুম্মদের মধ্যে বর্তমানে ভ্রাতৃঘাতি হানাহানি অব্যাহত রয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

আমি সরাসরি জেএসএস বা ইউপিডিএফের সঙ্গে যুক্ত নই। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আমি একজন সক্রিয় সমর্থক হিসেবে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করি এবং স্বভাবতই জেএসএসের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের যে কোন কর্মসূচিতে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। সেই সুবাদে আমি জেএসএস-ইউপিডিএফের কথিত সমঝোতা বিষয়ে প্রায়ই পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি। তারই আলোকে ইউপিডিএফের সমঝোতা প্রস্তাব নিয়ে আমি খোঁজখবর রাখার বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার যেমন চেষ্টা করি তেমনি এ বিষয়ে জেএসএসের অবস্থান সম্পর্কেও বুঝার চেষ্টা করি।

যতটুক জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর সময়ে জেএসএস সমঝোতার কম উদ্যোগ নেয়নি। তৎকালীন সময়ে উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ অনেকের মধ্যস্ততায় জেএসএসের পক্ষে সেই সময় লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা, সত্যবীর দেওয়ান ও তাতিন্দ্র লাল চাকমা ইউপিডিএফের সাথে সমঝোতা সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। কয়েক দফা সংলাপের পর একপর্যায়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই সমঝোতা চুক্তির কালি শুকাতে না শুকাতে ১২ ঘন্টার মাথায় জেএসএসের একজন নিরস্ত্র সদস্যকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে। তখন থেকেই জেএসএস ইউপিডিএফের সমঝোতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের সাথে যে 'ভুলে যাওয়া ক্ষমা করা' নীতির ভিত্তিতে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল সেই চুক্তিকে ভূলণ্ঠিত করে বিভেদপন্থী চার কুচক্রী অতর্কিত আক্রমণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করেছিল। বিভেদপন্থীরা 'ভুলে যাওয়া ক্ষমা করা' নীতির ভিত্তিতে যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তা ছিল ছলনা ও রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির অপকৌশল। মূলতঃ নিজেদের কোণঠাসা অবস্থা বুঝে সময় নেয়ার জন্য এবং তার ফাঁকে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে পুনঃআক্রমণের জন্য সেদিন বিভেদপন্থীরা সেই ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছিল। ইউপিডিএফের সাথে জেএসএসের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের ১২ ঘন্টার মাথায় ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক জেএসএস সদস্যকে হত্যার মধ্যেও সেই ছলনা বা ধোঁকাবাজি ক্রিয়াশীল ছিল বলে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এই দুটো ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা বা একই ষড়যন্ত্রের নীলনকশা থেকে ভূমিষ্ঠ- তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এমন তিক্ত ও মীরজাফরী অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সমঝোতার ক্ষেত্রে জেএসএস বরাবরই জাতীয় স্বার্থে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে ধারণা করা হয়। তারই অংশ হিসেবে সর্বশেষ ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে

সমঝোতার উদ্যোগ চলে। জেএসএস খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের প্রার্থীকে সমর্থন দেবে আর পক্ষান্তরে ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের জেএসএসের দুই প্রার্থীকে সমর্থন দেবে- এটাই হচ্ছে সমঝোতার মূল ভিত্তি বা শর্ত। ইউপিডিএফের নানা তালবাহানা সত্ত্বেও একপর্যায়ে নির্বাচনের একদম চূড়ান্ত দিনক্ষণে সমঝোতাও হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা বাঁধে কে স্বাক্ষর করবে তা নিয়ে। জেএসএসের পক্ষ থেকে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য যে কেন্দ্রীয় সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছে ইউপিডিএফ তাকে মানবে না। তারা জেএসএসের আরো সিনিয়র নেতা চায়। জেএসএসের প্রতিনিধি জেএসএসই ঠিক করবে এটাই তো নীতি হওয়া উচিৎ। এখানে ইউপিডিএফের নাক গলানোর কী আছে। যেমনটি ইউপিডিএফের কে স্বাক্ষর করবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেএসএসের নাক গলানোর কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কিন্তু এই ঠুনকো বিষয়ে ইউপিডিএফ অনঢ় থাকে। আর তার দুই কি একদিন পর নির্বাচন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই সমঝোতা সেখানেই ভেঙ্গে যায়। এ থেকে বুঝা যায় ইউপিডিএফ মূলতঃ সময় ক্ষেপণের জন্যই সেই অপকৌশল বা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল। অথচ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমঝোতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ বা উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু ইউপিডিএফের নানা তালবাহানার কারণে একপর্যায়ে সেটা ভেস্তে যায়। আর এখন সেই ধোঁকাবাজরাই বেশি বড় গলায় সমঝোতার কথা বলছে, জাতীয় ঐক্যের জন্য জোর গলায় বুলি আওড়াচ্ছে। হায় সেলুকাস!

ইউপিডিএফ তার জন্মলগ্ন থেকে শাসকগোষ্ঠী ও সরকারের কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে আগাগোড়ায় যে লেজে গোবরে সম্পর্ক যুক্ত ছিল তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। সরকারের কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের ছত্রছায়ায় তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা এতই বেড়ে গিয়েছিল তারা রাজনৈতিক হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে। সেই রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতার অংশ হিসেবে ইউপিডিএফ এক সময় প্রতিষ্ঠিত সরকারের মতো জেএসএস সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। প্রথমে ২০০৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম দফায় তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে, পরে এর মেয়াদ ২০০৬ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘোষণা করে। ইউপিডিএফ একদিকে শাসকের মতো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে, অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে সমঝোতা বা ঐক্যের ডাক দেয়- এই হচ্ছে ইউপিডিএফের রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতা।

বস্তুত: ইউপিডিএফের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা এবং সেজন্য জেএসএস নেতৃত্ব ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে গলা টিপে স্তব্ধ করা। সেই লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন', 'সমঝোতা', 'ঐক্য' ইত্যাদি নানা ধরনের সস্তা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত শ্লোগান তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে চলেছে।

আশ্চর্য লাগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে কেন্দ্র করে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪ বছর ধরে জুম্মদের উপর বিভেদ, হানাহানি, সংঘাত ও সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়েছে তারাই আজ বড় গলায় সমঝোতা, ঐক্য ও শান্তির কথা বলছে। অনেকটা 'চোরের মায়ের বড় গলা' এর মতো। আর ইউপিডিএফের মদদপুষ্ঠ কিছু সংখ্যক আত্মকেন্দ্রিক সমাজপতি অতি উৎসাহী হয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর ঘটনার বিচার-বিবেচনা না করে তোতা পাখির মতো শান্তি ও ঐক্যের দোহাই দিয়ে জেএসএস এর নেতৃত্বের উপর চাপ দিতে শুরু করেছে। অথচ ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে যখন জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের একটা ন্যূনতম ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল তখনি এটাকে বানচাল করার লক্ষ্যে ইউপিডিএফের ক্ষমতালিপ্সু ও বিভেদকামীরা জেএসএসের নেতৃত্ব ধ্বংস করতে সশস্ত্র সন্ত্রাস ও হানাহানি শুরু করছিল তখন তারা কোথায় ছিল? সে সময়ে ইউপিডিএফের সবে শুরু করা বিভেদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের গলা নীরব ছিল কেন? কেন সেসময় তারা বিভেদের বীজ চারা থাকতে ইউপিডিএফের বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি? কোন মতলবে তারা সেদিন এই বিষপাম্প মহীরুহে পরিণত হওয়ার সময়টুকু অপেক্ষা করেছিল?

জেএসএসের ভাষায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিরঙ্কুশভাবে সব জুম্মরা মানবে এটা তারা কখনো ভাবেনি। প্রত্যেকের অধিকার আছে চুক্তিকে মানার, আবার না মানার। আর অধিকতর অধিকার কে না চায়? পার্বত্য চুক্তি থেকে অধিকতর অধিকার কেউ যদি আনতে পারে তার চেয়ে উত্তম কথা কি থাকতে পারে? কিন্তু চুক্তিকে না মানার অজুহাত দেখিয়ে বা তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আদায়ের সস্তা আওয়াজ তুলে আড়াই দশক ধরে জীবন বাজি রেখে আন্দোলন করা জেএসএসকে ধ্বংস করার জন্য জুম্মদের উপর সশস্ত্র সন্ত্রাস ও সংঘাত চাপিয়ে দেয়া কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যারা আজকে জুম্মদের উপর সশস্ত্র সন্ত্রাস ও সংঘাত চাপিয়ে দিয়েছে তাদেরকে সেই সন্ত্রাস ও সংঘাত থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা না করে তথাকথিত সমঝোতা, ঐক্য ও শান্তির কথা বলে কোন লাভ নেই। জেএসএস স্পষ্টভাবে বলেছে, ইউপিডিএফ জেএসএস নেতৃত্বকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পরিচালিত তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাস ও সংঘাত থেকে সরে আসুক, সেলক্ষ্যে তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ যে কোন একটি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিক এবং হত্যা, গুম, অপহরণের রাজনীতি থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হোক। অস্ত্র কাঁধে নিয়ে বা অস্ত্র তাক করে সমঝোতা ও শান্তির কথা বলা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। ইউপিডিএফের মদদপুষ্ঠ তথাকথিত সমাজপতিরা না বুঝলেও সাধারণ জুম্ম জনগণ ইউপিডিএফের এই ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি ইতিমধ্যে সহজেই বুঝতে পেরেছে।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যখন জেএসএসের সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছিল তখন ইউপিডিএফের চামুন্ডারা ভেবেছিল যে, নিরস্ত্র জেএসএসকে অস্ত্র দিয়ে সহজেই ঘায়েল করা যাবে। সেজন্যই কোন বাছ-বিচার ছাড়া জেএসএস সদস্যদের উপর সশস্ত্র হামলা, অপহরণ ও হত্যা শুরু করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি 'মরা সুগুনিও পুরতে সলাত এক পাক্ খায়'। চুক্তি-পক্ষ যখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ইউপিডিএফকে সকল ক্ষেত্রে কোনঠাসা করলো তখন তাদের একের পর এক 'সমঝোতা', 'ঐক্য', 'অনাক্রমণ' ইত্যাদি সস্তা শ্লোগানে চিৎকার করে উঠলো। আর সেই সাথে কতিপয় সুযোগ সন্ত্রাসী কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা ইউপিডিএফের রাজনৈতিক চালবাজির বিচার-বিশ্লেষণ না করে তাতে 'সাধু সাধু' বলতে শুরু করলো।

বিগত ১৪ বছরের অভিজ্ঞতায় জুম্ম জনগণ ইউপিডিএফের

তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' এর শ্লোগান ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। জুম্ম জনগণ আর ইউপিডিএফের সেই সস্তা শ্লোগানে বিশ্বাস করে না বা আর মোহিত হয় না। সঞ্চয়, দীপ্তিশঙ্কর, প্রতিকার, কবিতা, দেবাশীষ, চম্পানন, শিবাশীষ, পিন্টু, পুলক, দীপঙ্কর, উৎপলকান্তি, ইলিরা ইউপিডিএফের সস্তা রাজনীতি পরিত্যাগ করে স্ব স্ব কর্মজীবনে নিমগ্ন হয়েছে। দীপায়ন, অভিলাষ, গোর্কিরা জেএসএস এর নেতৃত্বাধীন চুক্তি বাস্তবায়নের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। বর্তমান ইউপিডিএফ বলতে গেলে এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বশূণ্য। রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা, সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া। তারা এখন বড়জোর নিরীহ মানুষ খুন করতে পারবে বা শুভলং এলাকার মতো গ্রামবাসীদের অপহরণ করতে পারবে, তাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে সাময়িক ঘোলাতে করতে পারবে মাত্র; কিন্তু জুম্মদের অধিকার আদায়ে লেশমাত্র ভূমিকা তারা পালন করতে পারবে বলে মনে করা যায় না। মানুষ এখন আর ইউপিডিএফকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মনে করেনা, হিসেবের মধ্যে নিতে হচ্ছে তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাস, হত্যা, অপহরণের কারণে। সাধারণ নিরস্ত্র নিরীহ মানুষ তাদের অস্ত্র ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। তাই তারা ইউপিডিএফকে ভয় করে, ভীতির চোখে দেখে। জাতীয় মুক্তির কান্ডারী হিসেবে বা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আর দেখে না বা দেখার প্রশ্নই উঠে না।

সন্তু লারমাকে নিয়ে ইউপিডিএফের অপপ্রচারের ঘাটতি নেই। 'জেএসএসের সকল নেতা ও কর্মীরা সমঝোতা চায় শুধু সন্তু লারমা চায় না' বলে তারা গোড়া থেকে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। জেএসএসের সকল নেতা-কর্মীরা যদি চাইলে তাহলে সন্তু লারমা না চাওয়ার কে? এটা স্রেফ জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং কর্মীবাহিনী থেকে সন্তু লারমাকে বিচ্ছিন্ন করার একটা ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। এ ধরনের ষড়যন্ত্র ইউপিডিএফ ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক জেএসএস কর্মীদের অস্ত্র জমাদানকালেও করেছিল। দক্ষিণে গিয়ে তারা জেএসএস কর্মীদের বলেছিল উত্তরের একটি গ্রুপ সন্তু লারমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তারা অস্ত্র জমা দেবে না। আবার উত্তরে গিয়ে বলেছিল দক্ষিণের একটি গ্রুপ বিদ্রোহ করেছিল। এভাবে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দিয়ে জেএসএস কর্মীদের ভাগ করতে চেয়েছিল সে সময়। কিন্তু সেদিনও তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। জেএসএস নেতৃত্ব বরাবরই সঠিক ও ঐক্যবদ্ধ ছিল বলে তাদের সেই অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। জনগণ ও কর্মীবাহিনী থেকে সন্তু লারমাকে বিচ্ছিন্ন করার ইউপিডিএফের বর্তমান ষড়যন্ত্রও কখনো সফল হবে না, হতে পারে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা জেএসএসকে দুর্বল ভেবে জেএসএস সদস্যদের অস্ত্র জমাদানের অব্যবহতি পরে সশস্ত্রভাবে হামলা শুরু করেছিল, তথাকথিত ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চাপিয়ে দিয়েছিল, যে কারণে বিগত ১৪ বছরে শত শত জুম্মদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, তাদের মুখে 'চোরের মায়ের বড় গলা'র মতো সমঝোতা, ঐক্য ও অনাক্রমণের কথা বলা মানেই কখনোই সদিচ্ছাপ্রসূত হতে পারে না; নিঃসন্দেহে তা দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রমূলমূলক। ইতিপূর্বেকার সমঝোতা সম্পন্ন হতে না হতেই জেএসএস সদস্যদের গুলি করে হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউপিডিএফের সেই মতলববাজির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের মতলববাজির কোন ঘাটতি নেই। তারা পার্বত্য চুক্তিকে কালো চুক্তি বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জন্মলগ্ন থেকেই চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু দেশে-বিদেশে প্রবল চাপের মুখে পড়ে অতি সম্প্রতি তারা পার্বত্য চুক্তিকে সমর্থন করে বলে ঘোষণা দিয়েছে। যারা চুক্তি বিরোধিতা করে ১৪ বছর ধরে জুম্মদের মধ্যে বিভেদের বিষবৃক্ষ লালন করেছিল তারা এতকিছু লঙ্কাকান্ডের পরে এখন বলছে তারা চুক্তিকে মানে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে তারা জেএসএসকে সমর্থন দেবে। এ থেকে আর চালবাজি কি থাকতে পারে তা পাঠকরা বিবেচনা করবেন। চালবাজির ধূর্তামী আরো আছে। মুখে তারা পার্বত্য চুক্তিকে সমর্থন করে বলে ঘোষণা দিলেও তাদের দলীয় ইসতেহার বা ঘোষণাপত্রে পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে পূর্বের বক্তব্যের বা নীতিগত অবস্থানের কোন পরিবর্তন নেই। তাদের ইসতেহারে বা ঘোষণাপত্রে পূর্বের মতো চুক্তি বিরোধী ও জেএসএস বিরোধী বক্তব্য বহাল তবিয়তে বিদ্যমান রয়েছে। এই হচ্ছে তাদের ধাপ্পাবাজির নমুনা। শুধু তাই নয়, গত বছরও জেএসএসের পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তি কর্মসূচিতে তারা বাধা প্রদান করেছিল। সে সময় যারা জেএসএসের পার্বত্য চুক্তি বর্ষপূর্তি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে ফেরার পথে সঙ্গে করে ১০ কেজি হাঙ্গর মাছ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেয়ার জন্য) নিতে বলা হয়েছিল।

বিভেদকামী ইউপিডিএফের চালবাজির এখানেই শেষ নয়। তারা নিজেদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকার করে না। নিজেদেরকে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' হিসেবে দাবি করে। অতি মার্ক্সবাদী বা বামপন্থী সেজে 'আদিবাসী' শবদটিকে সাম্রাজ্যবাদের শব্দ ও কারসাজি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই এ বছর তাদের প্রতিনিধি জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে অংশগ্রহণ করে। আরো অবাক হবার মতো যে, অতি সম্প্রতি ইউপিডিএফের দ্বিতীয় চেলা হিসেবে খ্যাত রবি শংকর চাকমা জাতিসংঘের 'আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র' এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে তা অনুস্বাক্ষর (রেটিফাই) করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে। যদিও জাতিসংঘের কোন ঘোষণাপত্রকে রেটিফাই (অনুস্বাক্ষর/অনুসমর্থন) করার কোন রেওয়াজ নেই তা সত্ত্বেও তাদের রেটিফাই করার আহ্বান না হয় বাদই দেয়া গেল; কিন্তু যারা ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কালে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে দেশের আপামর আদিবাসী জনগণ, নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো যখন একাট্টা, ঠিক সেই সময় তারা আদিবাসী শব্দটির বিরোধিতা করে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' হিসেবে দাবি তুলে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল সেই বিতর্ক সৃষ্টিকারীরাই আবার 'জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রকে রেটিফাই করার আহ্বান' কত বড় ভেলকিবাজি হতে পারে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

বস্তুতঃ ইউপিডিএফের চালবাজি, ধাপ্পাবাজি, ভেলকিবাজি আর কত দেখবো? যারা সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে জুম্মদের উপর বিভেদ ও সংঘাত চাপিয়ে দিয়েছে তাদের মুখে বড় গলায় কত আর ঐক্য ও সমঝোতার কথা শুনবো? জুম্ম জনগণের উপর ইউপিডিএফের চাপিয়ে দেয়া বিভেদ, সংঘাত ও ভেলকিবাজি কতদিন আর চলতে দেবো?

দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই এবং পূর্ণস্বায়ত্তশাসন : কথিত জাতীয় ঐক্য

॥ দীপায়ন খীসা ॥

১৯৮২ থেকে ৮৫এই সময়কাল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাসের ঘটনাবহুল সময় ও কলংকিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯৭২ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হওয়ার পর থেকে পাহাড়ের সমাজ জীবন বদলে যেতে থাকে। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জুম্ম জনগণের প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে পাহাড়ে শুরু হয় প্রতিরোধ সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সে সংগ্রামের অগ্রনায়ক ও বীর সেনানী। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পাহাড়ে একের পর এক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সোনালী ও গৌরবের অধ্যায় রচিত হতে থাকে। ১৯৮২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জনসংহতি সমিতির ২য় কংগ্রেস শুরু হয়। এই ২য় কংগ্রেসে বিভেদপন্থীরা হাজির করে দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব। এই চটকদারী তত্ত্বের আড়ালে প্রধান কাজটি হলো তিল তিল করে গড়ে তোলা প্রতিরোধ সংগ্রামের বুকে ছুরিকাঘাত করা। এই অংশটি দ্রুত যুদ্ধের মাধ্যমে সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করার এক হঠকারী লাইন গ্রহণ করার জন্য পার্টি কংগ্রেসে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু পার্টি কংগ্রেস তাদের এই ভ্রান্ত লাইন অনুমোদন করেনি। কিন্তু গিরি (ভবতোষ দেওয়ান), প্রকাশ (প্রীতিকুমার চাকমা), দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা), পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) এই চার কুচক্রী জুম্ম জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকে বিপথগামী করার লক্ষে তাদের দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্য গোপন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে। এই ভাবে শুরু হয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জাল। কথিত এই দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই আসলে একটি নিছক বাগাড়ম্বর ব্যাপার ছিল মাত্র। মূল বিষয়টি ছিল গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে পার্টিকে দুর্বল করে দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনা করা। তাই একটি চটকদারী সস্তা শ্লোগান দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পথে এই কুচক্রিরা অগ্রসর হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্টির বৃহত্তর ঐক্য বজায় রাখার বৃহত্তর স্বার্থে সকল প্রকার সংঘাত ও সংঘর্ষ পরিহার করার লক্ষে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সে পথে হাটেননি। তারা ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এম এন লারমার অবস্থানে হামলা চালায়। সুপরিকল্পিত এই হামলায় জুম্ম জনগণের মুক্তির অগ্রদূত এম এন লারমার জীবন প্রদীপ অকালে নিভে যায়। তাদের কথিত দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল জনসংহতি সমিতির মূল নেতৃত্ব। সরকার কিংবা শাসকগোষ্ঠী তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলনা কখনও।

জুম্ম জনগণের মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাদের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের আসল খোলস বেরিয়ে আসে। বিভেদপন্থী এই কুচক্রীদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করা আর লড়াই সংগ্রামকে দুর্বল করে দেয়া। কিন্তু কুচক্রীরা সফল হতে পারেনি। পার্টি এম এন লারমার আদর্শকে সমুন্নত রেখে আবারও ঘুরে দাঁড়ায়। সন্তু লারমার নেতৃত্বে সফলভাবে জুম্ম জনগণকে আবার সংগ্রামের পথে, আত্মবলিদানের পথে, প্রতিরোধের পথে সুসংগঠিত করতে সক্ষম হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হয়।

পার্বত্য চুক্তি স্বারের প্রাক্কালে আবারও জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা হয় সুকৌশলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে প্রত্যাখান করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতি আবারও বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়।

কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে আবারও জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা হয় সুকৌশলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে প্রত্যাখান করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতি আবারও বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়। দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্বের ন্যায় পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের ডাক দেওয়ার বিষয়টি আরও অধিক চটকদারি তাতে সন্দেহ নেই। এটাই সাম্রাজ্যবাদী আর শাসকগোষ্ঠীর একটি খেলা। নিপীড়িত ও মুক্তিকামী মানুষের অর্জনকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের ধারক বাহক উগ্রজাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী শক্তি এই ষড়যন্ত্রের কৌশল অবলম্বন করে। চলমান লড়াই সংগ্রামের চেয়ে আরও তথাকথিত অধিকতর দাবি সম্বলিত এজেন্ডা তৈরি করে ষড়যন্ত্রকারীরা মূল প্রতিরোধ সংগ্রামকে কানাগলিতে

হারিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে। দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্ব আর পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দুটোই সেই এজেন্ডারই অংশ। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ নয় স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাধিকার পাওয়ার যে স্বপ্নবিলাস তা মূল সংগ্রামকে ধ্বংস করে দেয়ার চক্রান্তেরই অংশ ছিল ইতিহাস তার স্বাক্ষী। সেই সময় গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের বিপরীতে দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে লড়াইয়ের ইতি টানার তত্ত্ব হাজির করে আরো অধিক বিপ্লবীপনা দেখিয়ে জুম্ম জনগণকে মোহগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল। কিন্তু তারা আজ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। তাদের কথিত দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের অবসানও বেশ দ্রুততার সাথে ঘটে যায়। ১৯৮২সালে শুরু হয়ে ৮৫তে এসে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে তাদের কথিত সংগ্রামের যবনিকা ঘটে। এই ষড়যন্ত্রে পার্টি এবং জুম্ম জনগণকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ হারিয়েছে তাদের প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। এই খানেই ইতিহাসের একটি পর্যবেক্ষণ বার বার সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। সেটা হলো অতিবিপ্লবী আর দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রীয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদের অনুগত শাসকশ্রেণী পরস্পরের বন্ধু।

১৯৯৭সালে জুম্ম জনগণ যখন চুক্তির মাধ্যমে অধিকার অর্জন করলো সেই অর্জনকে ধ্বংস করার জন্য আবারও অতিবিপ্লবীগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো। এবারের মন্ত্র হলো চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অধিকারকে বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। এই চুক্তি আপোষনামা ছাড়া কিছু নয়। তাই এই চুক্তি বাতিল করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। সূদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ যে অধিকার অর্জন করেছে সেই অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, সেই অর্জনের সুফল যাতে জুম্ম জনগণ ভোগ করতে না পারে তার জন্য সুকৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে আপোষ চুক্তি আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবি তোলা হয়। এই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়ন করার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নামে একটি কথিত রাজনৈতিক সংগঠনেরও জন্ম দেয়া হয়। জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতিকে আরো একবার কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় বিভাজন করে দেয়া হলো। চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের ন্যায় প্রসিত খীসা ও তার গংদের প্রধান কর্মসূচি হয়ে দাঁড়াল জনসংহতি সমিতিকে আঘাত করা, নির্মূল করা, কর্মী বাহিনী ও নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দেয়া আর পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বানচাল করা। গণমানুষের বিপ্লবকে, লড়াই সংগ্রামকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠীর পরিবর্তে বেশি চটকদার বুলি নিয়ে অধিক নাশকতামূলক কর্মসূচি দিয়ে তাদের অনুচরদের মাঠে নামিয়ে দেয়। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন-এর দাবি এবং ইউপিডিএফ শাসকশ্রেণীর তৈরি করা সেই ধরণের একটি কর্মসূচি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত না হয়, চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামকে যেন সুসংগঠিত করা না যায় সেই ষড়যন্ত্রকে বাস্তব রূপ দিতে ইউপিডিএফকে সশস্ত্রভাবে মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়।

১৯৮২-৮৩ সালে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-প্রকাশরা দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্বের মাধ্যমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যার মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি সমাপ্ত করে। জুম্ম জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, মুক্তির সংগ্রামকে ধ্বংস করে দেয়ার শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র এইভাবে চার কুচক্রী বাস্তবায়ন করে দেয়। সেই সময় প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। লড়াইয়ের তীব্রতা অনুভব করতে পেরে শাসকগোষ্ঠী দ্রুত নিষ্পত্তির মত অতিবিপ্লবী তত্ত্ব হাজির করে সংগ্রামকে কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত করতে সক্ষম হয়। ১৯৮২-৮৩ তে জুম্ম জনগণের বিজয় অর্জনের পথ বাধাগ্রস্ত করে দেয়া হয়। সেইখানেই তাদের কর্মসূচির সমাপ্তিও ঘটে। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে কর্মসূচি তার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং অনেক বেশি বিরামহীন। কারণ বর্তমান সময়ে জুম্ম জনগণের একটি অর্জন রয়েছে। সেই অর্জনকে নস্যাৎ করার কর্মসূচি আরও পরিকল্পিতভাবে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কর্মসূচি সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তার বাস্তবায়নের দিকটাও তাই কিছুটা গণমুখী করে তুলতে হবে। আমরা দেখি ১৯৮২-৮৩ তে পার্টি যখন ঐক্য ও সংলাপের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছিল তখন চার কুচক্রী আক্রমণ হানতে থাকে এবং একটি গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বর্তমানে ইউপিডিএফ এবং প্রসিত খীসাদের কর্মসূচি কিছুটা ভিন্ন। তারা একদিকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায়, জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করার কর্মসূচি চলমান রাখে, আবার অন্য দিকে চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতার কথা বলে এবং জনসংহতি সমিতির সাথে ঐক্য আর সংলাপের প্রস্তাবও প্রচার করে। জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করার লক্ষে পার্টি বিষয়ে জনগণের মধ্যে একটি বিরূপ ও নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে দেয়ার কাজটিও ইউপিডিএফ বেশ সুচারুভাবে চালু রেখেছে।

বর্তমান সময়ে ইউপিডিএফ তাদের প্রচারণার একটি বড় সময় ব্যয় করে জনসংহতি সমিতির মূল নেতৃত্বের চরিত্র হনন করার কাজে। এটাও শাসকগোষ্ঠীদের একটা বড় কৌশল। নেতৃত্ব নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি করে দিয়ে মূল আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়া। আর ইউপিডিএফ-এর আরেকটি প্রধান কর্মসূচি হল জাতীয় ঐক্যের প্রচারণা করা এবং মানুষের মনে ধারণা তৈরি করে দেওয়া যে, জনসংহতি সমিতিই ঐক্য প্রচেষ্টার বিরোধী। অর্থাৎ আন্দোলনকে ছিনতাই করা, বিপথে পরিচালিত করার সকল ফ্রন্টে ইউপিডিএফ ক্রিয়াশীল। ১৯৯৭ সালের চুক্তি পরবর্তী সময় থেকে ইউপিডিএফ নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের এই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের যে অর্জন, সে অর্জনকে পুরোপুরি ধ্বংসের আয়োজনের অংশ হিসেবে ইউপিডিএফ জাতীয় ঐক্য এবং সংলাপের কর্মসূচি প্রচার করার কাজে নেমেছে। ইউপিডিএফ ঐক্যের কথা বলে আলোচনার প্রস্তাব দেয় আর জনসংহতি সমিতি ঐক্যে বিশ্বাস করেনা। এই ধারণা টি জনগণের মনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তারা ঐক্যের হাঁক-ডাক করে। ঘটা করে ঐক্যের আয়োজন করে। ঐক্যের কর্মসূচি নিয়ে মিছিল সমাবেশ করে। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ঐক্যের বিষয়ে সংঘদান করে। বিষয়টি হাস্যকর মনে হলেও বিপদজনক। তারা সুকৌশলে ধর্মকে রাজনীতেতে ব্যবহার করছে। ধর্মের সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে রাজনীতি করার এক বিপদজনক ফাঁদে ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণকে ফেলতে যাচ্ছে

এই বিষয়টা আমাদের অনুধাবন করা জরুরি। জুম্ম জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকে বিপথগামী করার এটাও একটা অন্যতম কর্মসূচি।

পরিশেষে যে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার সেটা হল ইউপিডিএফ এবং প্রসিত খীসাদের প্রধানতম কাজটি হল জুম্ম জনগণের অর্জনকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া। দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্বের মাধ্যমে ১৯৮২, ৮৩ ও ৮৪ তে গিরি দেবেনরা এম এন লারমাকে হত্যার মধ্য দিয়ে যে কাজটি করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল কথিত পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের কথা বলে প্রসিত খীসারা বর্তমান সময়ে সেই কাজটিকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জুম্ম জনগণের অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি অকার্যকর করে দেয়া, চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে যেন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে না ওঠে সেই কারণেই শাসকগোষ্ঠী মহান বাণী দিয়ে ইউপিডিএফের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে মোহিত ও ব্যতিব্যস্ত রাখতে চায়। আসলে ইউপিডিএফ-এর প্রধান কাজ হলো পূর্ণস্বায়ত্তশাসন, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি প্রচার করে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পাহাড়ের সুদীর্ঘকালের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে সন্দেহ আর অবিশ্বাস তৈরি করে দিয়ে জুম্ম জনগণের অর্জনকে ছিনতাই করে শাসকগোষ্ঠীর জুম্ম ধ্বংসের কর্মসূচিকে সহায়তা করা।

ইউপিডএফ দলটি ১৯৯৭ থেকে ২০১২ প্রায় ১৫ বছর ধরে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন নামক একটি ভেজাল বটিকা বিক্রির নিষ্ফল প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের বটিকার এখন আর তেমন বিকিকিনি নেই। এই পূর্ণস্বায়ত্তশাসন বটিকার প্রয়োগ ইতিমধ্যে বিফলে যেতে বসেছে। এই বটিকার ভেজালের প্রমাণ জনগণ পেয়ে গেছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন বটিকার মাধ্যমে লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে এখন প্রসিত খীসারা জাতীয় ঐক্যের নুতন টেবলেট বাজারে ছেড়েছে। দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আর হালনাগাদের জাতীয় ঐক্য একই কোম্পানীরই ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের নাম। প্রাণবিনাশী এই বটিকাগুলো শাসকগোষ্ঠী প্রস্তুত করে তাদের অনুগত বাহিনীর মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে। এই ঔষধগুলোর মূল কাজ হচ্ছে জুম্ম নিধন করা। ইউপিডিএফ এখন কথিত জাতীয় ঐক্যের বটিকা জুম্মদেরকে গিলানোর জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। প্রসিত খীসারা তাই এই জাতীয় ঐক্যের বটিকা নিয়ে নানান কিসিমের বিজ্ঞাপন প্রচার করা শুরু করেছে। কথিত জাতীয় ঐক্যের চটকদার বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রসিত খীসার অনুগামীরা মিছিল, সমাবেশ করে যাচ্ছে। বেনামী প্রকাশনায়, ফেইস বুকের বিভিন্ন গ্রুপে, বৌদ্ধ বিহারের প্রার্থনায় তারা জাতীয় ঐক্যের নানান গুণ-গান প্রচার করছে। নিরপেক্ষবাদী বলে পরিচয়দানকারী ছাপোষা পেশাজীবিদের একটি মহলও এই জাতীয় ঐক্যের ঘুর্ণিপাকে ঘুর খাচ্ছে। ইউপিডিএফ প্রচারিত জাতীয় ঐক্যের বিজ্ঞাপনটিও সুপার ফ্লপ হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ ভেজাল এবং মেকী জিনিষ মানুষকে কিছুটা সময়ের জন্য প্রলুব্ধ করতে পারলেও চুড়ান্ত বিচারে সেটা পরিত্যাজ্য হয়ে যায়। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন থেকে যেভাবে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেভাবে কথিত জাতীয় ঐক্যের ভেল্কীবাজিও খুব বেশি টেকসই হবে না। শাসকগোষ্ঠী ইউপিডিএফ-এর মাধ্যমে এই কথিত জাতীয় ঐক্যের মায়াজালে জুম্ম জনগণকে আটকে রাখতে চায়। এইভাবে মায়াজালের ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম থেকে জুম্মদেরকে বিরত রাখা যাবে।

প্রকাশ-দেবেনরা এম এন লারমাকে হত্যা করার পরও জনসংহতি সমিতি যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জুম্ম জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকে সংগঠিত করেছে, ঠিক সেভাবে ইউপিডিএফ-এর ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আন্দোলনকে সঠিক পথে চলমান রাখতে জনসংহতি সমিতি নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ পূর্ববর্তী যখন কথিত ইউপিডিএফ দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটেনি তখন পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে প্রিয় নেতা এম এন লারমাকে স্মরণ করতো। সামরিক শাসকদের রক্ত চক্ষু এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের আশংকাও লারমাকে শ্রদ্ধা জানানো থেকে পাহাড়ি গণ পরিষদ, ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে সেই সময় নিবৃত্ত করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৯৭ পর যখন গিরি-প্রকাশ-দেবেন-প্রকাশদের অসম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করার কর্মসূচি প্রসিত-রবিশংকররা গ্রহণ করলো তখন থেকেই লারমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে ইতিহাসের খলনায়করা আবার ফিরে আসে। ইউপিডিএফের কাঁধে চড়ে চক্রান্তকারীরা আবার জুম্ম জনগণের উপর ভর করে। তাই আমরা দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলতে পারি প্রসিত খীসাদের প্রচারিত কথিত জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্বেরই নতুন সংস্করণ। উগ্র জাতিয়তাবাদী, মৌলবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তল্পিবাহক শাসকশ্রেণীই এই ইউপিডিএফ, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন এবং কথিত জাতীয় ঐক্যের প্রকাশক ও গ্রন্থসত্বের মালিক। এই ধ্বংসাত্মক খেলার চিত্র, শ্লোগান ও কার্যক্রম শুধু রদ-বদল হয়। কখনও গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ, কখনও প্রসিত-রবিশংকর, কখনও রূপায়ন-সুধাসিন্ধু, চন্দ্রশেখর-তাতিন্দ্র, কখনও দ্রুত নিষ্পত্তি, কখনও পূর্ণস্বায়ত্তশাসন, আবার কখনও নেতৃত্বের সংস্কার– এইভাবে পার্বত্য অঞ্চলে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে। শাসকগোষ্ঠীর ইসলামী সম্প্রসারণবাদের প্রকল্পের ঠিকাদাররা আমাদের কাছে অচেনা থাকেনা। চলমান এই ষড়যন্ত্র সফল করতে নিত্য নতুন ঠিকাদার নিয়োগ পান। আর এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শিক্ষা আমাদেরকে পথ নির্দেশ করে। ১০ নভেম্বর এলে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। মেকী বিপ্লবীদের পুচ্ছ হৃদয় কেঁপে উঠে। ১০ নভেম্বর জুম্মদের জাতীয় জীবনে শোকের দিন হলেও এই দিনটি আত্মবলিদানের এক সুমহান গৌরব গাঁথা হয়ে যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। প্রিয় নেতার জীবন বাঁচাতে একে একে আট সহযোদ্ধা যেভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে তা সত্যিই এক অনন্য বীরত্বেরই স্মারক হয়ে থাকবে।

এম এন লারমার নির্দেশিত পথই মুক্তির পথ

॥ বিনয় কুমার ত্রিপুরা ॥

আজ ১০ নভেম্বর। আশি দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়া জুম্ম জাতির এক বেদনার দিন। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। চার কুচক্রী ষড়যন্ত্রকারী বিভেদপন্থীদের হাতে আজকের এইদিনে জুম্ম জাতির অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অতর্কিত আক্রমণে নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। সেই '৮৩ মর্মান্তিক ট্রাজেডি আজও জুম্ম জাতিকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। প্রতিবছর এই দিনে শীতের হিমেল হাওয়ায় বয়ে আনে শোকের বার্তা- ১০ই নভেম্বর। এই দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা; গভীর শোক আর ভালবাসায় ফুলে ফুলে সিক্ত হয় শহীদ বেদী। বীর শহীদদের আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি, বিপ্লবী লাল সালাম জানাই।

মহান নেতা এম এন লারমা আজও জুম্ম জাতির আন্দোলনের প্রাণশক্তি। তিনিই প্রথম জুম্ম জাতির মানসে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রগতিশীল নীতি-আদর্শ, চিন্তা-চেতনার বীজ বপন করে দেন। তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জুম্ম জাতিকে সসম্মানে অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। এম এন লারমা শোষিত মানব জীবনের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন- একজন মহান বিপ্লবী, মানবতাবাদী, সংগ্রামী মহান নেতা। তাঁর উদার, মানবিক, মানবমুখী, জীবনদর্শন আজও আমাদের মুক্তি চিত্তের সার্বক্ষণিক আদর্শ। তাঁর মহান নির্দেশিত পথই আমাদের মুক্তির পথ। আমরা তাঁর জীবন-দর্শনে, নীতি-আদর্শে সন্ধান পেয়েছি- বেঁচে থাকার সমস্ত উৎস। পেয়েছি অফুরন্ত চেতনা, পেয়েছি অফুরন্ত স্বপ্ন, সাহস ও ত্যাগের অনুপ্রেরণা। তিনি আজও আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, বলবার সাহস দেন। তিনিই প্রথম উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী, চরম জাতি-বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসীবাদী কূপমন্ডুক শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। তাঁর নির্দেশিত আদর্শিক পথেই যুগ যুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত জুম্ম জাতিকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় আচ্ছন্ন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল করে জয়ের পথে ধাবিত করবে। তিনি শাসকগোষ্ঠীর সকল প্রকার অমানবিক অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার ভাষা আমাদের শিখিয়ে গেছেন। তাঁর সংগ্রাম শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মানবতা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে তিনি অজেয়। তাঁর ভাষায়– 'যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।' তিনি জুম্ম জাতিকে মানবিক আদর্শের যে দীপ জ্বালিয়ে আলোর পথ দেখিয়ে গেছেন, তা আমাদের চিরকাল পথ দেখাবে। আজ এটাই প্রমাণিত হয়েছে নরপিশাচ ঘাতকদের বুলেট তাঁর জীবনকে ম্লান করে দিলেও তাঁর আদর্শিক চেতনাকে ম্লান করে দিতে পারেনি। এই আদর্শের জায়গাটিতে ঘাতকদের চিরকাল মাথা নত করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস মানে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী ইতিহাস। আর জুম্ম জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চিরঞ্জীব এক নাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের কথা স্মরণ করতে গেলেই মহান নেতা এম এন লারমার কথা এসে যায়। কারণ তিনিই জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও জুম্ম জাতির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা প্রথম বলেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, তা জোরালো ভাষায় বলার চেষ্টা করেছেন এবং তা কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন। সামন্তীয় চিন্তা ধারায় আচ্ছন্ন ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে হাজার হাজার ছাত্র-যুব সমাজকে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন। আজ যেমন শোকের দিন তেমনি অপরদিকে নতুন করে সংগ্রামী চেতনায় জ্বলে উঠবারও দিন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, 'গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না।' তিনি সংবিধান প্রণয়নকালে আরো বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত জাতিকে, অনগ্রসর জাতির সাথে সমান তালে এগিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে।' কিন্তু দঃখজনক হলেও সত্য এম এন লারমার দেখিয়ে দেয়া পথের সন্ধান পায়নি শাসকগোষ্ঠী! তৎকালীন সময়ে সংসদে দেয়া এম এন লারমার বক্তব্যগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে- সদ্য স্বাধীন দেশকে নিয়ে এমন গভীরভাবে ভালোবেসে তার মত অন্য কোন সদস্য বক্তব্য রেখেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। আর কোন সাংসদ বক্তব্য রাখেননি। এম এন লারমার বক্তব্যগুলো পড়লেই বুঝা যায়, তিনি

বাংলাদেশের কল্যাণসহ গরির দুঃখি মেহনতী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের কথা সব সময় চিন্তা করতেন। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে সর্বপ্রথম উপস্থাপিত বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এম এন লারমা বলেছিলেন– 'আমরা অঙ্গীকার করেছি যে, এমন একটা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করব, যেখানে সকল নাগরিকের আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হবে।... দেশের জনগণ চাই যে, তাদের পরিশ্রম দ্বারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন সার্থক হবে। তিনি আরো বলেছিলেন, আজ দেশের বাস্তু-হারাদের সমস্যা, ভিক্ষুকদের সমস্যা, তারপর কুলি-মজুরদের সমস্যা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন-যাপন করে, সেই কৃষকদের সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে, তার কোন ব্যবস্থা আমরা এই বাজেটে পাইনি।... বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের, কৃষক-সমাজের যদি উন্নতি না করতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হবে না। বাংলাদেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলে, সেই মাটিকে যদি জীবনের সাথে মিশিয়ে না নিই এবং সোনার ফসল উৎপাদনকারী কৃষককে যদি মূল্য না দিই, তাহলে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে?' তখন জাত্যাভিমানী বাঙালি শাসকগোষ্ঠী তা কর্ণপাত করেনি। এম এন লারমার বক্তব্যকে অবজ্ঞা, অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন ক্ষোভে-দঃখে এম এন লারমা বলেছিলেন, 'সংবিধানে এক রকম লেখা হবে, আর একদিকে অন্যরকম করবেন। আমাদের মানুষ হবার পথ উন্মুক্ত করে দিন। আমি সংবিধানকে খাট করা বা বিকৃত করার জন্য বলছি না। তাই সরকারের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন আমাদেরকে মানবতার পথ দেখিয়ে দিন। আমরা ধনী হতে চাই না, লাখপতি হতে চাই না।... মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে বলব আপনারা অত্যাচারী সরকার, গণবিরোধী সরকার। আপনারা যদি সরকার হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।' আওয়ামীলীগের নেতারা কথায় কথায় ইতিহাসের কথা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানসহ দেশের উন্নয়নের দাবি করে আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেন। কিন্তু আওয়ামীলীগ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে? অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতি-আগ্রাসী সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগ কিসের প্রমাণ দিল? সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের কাছে আওয়ামীলীগ সরকারের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করতে আমরা দেখেছি। এ দেশের শাসকগোষ্ঠী আমাদের ন্যায্য অধিকারকে বার বার অস্বীকার করে, অধিকার বঞ্চিত করে রেখেছে। এ যাবৎ বহু মুখরোচক প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার তা বেমালুম ভুলে যায়! জুম্ম জনগণ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শুধুমাত্র অবজ্ঞা, অবহেলার শিকার হচ্ছে তা নয়, রাষ্ট্রীয় চরম প্রতারণারও শিকার।

> তিনি সংবিধান প্রণয়নকালে আরো বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না।'

আজ স্বাধীনতার ৪১ বছরেও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জনগণ গণতন্ত্রের স্বাদ পায়নি। দিনের পর দিন রাষ্ট্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক অনিশ্চিত অন্ধকার পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশে সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট সমানতালে চলছে। উন্নয়ন, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, মানবতা, শব্দগুলো দিন দিন যেন আজ নিছক কথার কথা, মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তা আজ আরো বেশি যথার্থ হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দেখেননি। মহান নেতা এম এন লারমা শুধু জুম্ম জাতির মানসপটে নয়, তিনি অধিকারকামী সকল নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। ফলতঃ বর্তমানে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক দৈন্যতা বিরাজমান সে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আজ ক্যালেন্ডারের পাতা যতই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে জুম্ম জাতির মহান নেতা এম এন লারমার চিন্তা-চেতনা, আদর্শ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। আজ তাঁর নির্দেশিত পথের প্রাসঙ্গিকতা বড় বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীকে এটা স্মরণে রাখা দরকার- আমরা বীর জুম্ম জাতি! আমরা মাথানত করে নয়, মাথা উঁচু করে অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই। এই চাওয়া-পাওয়ার মেরুকরণে মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শিক চেতনাকে বুকে ধারণ করে সংগ্রামী চেতনায় আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব সমাজকে নতুন করে ভাববার যথেষ্ট সময়ের বাস্তবতা দাবি করছে। আমরা অধিকার হারা জুম্ম জাতি। আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। এই অধিকার আদায়ের জন্য অনেক পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতে হবে। অস্তিত্ব ও অধিকার হীনতার যন্ত্রণায় যে তরুণ বন্ধুরা ছটফট করছে। তাদের উচিত ঐতিহাসিক মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার। অধিকারহীন মৃত্যু-সম দঃসহ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মানে কি! শাসকগোষ্ঠীর কূটকৌশলে আমরা আর কতদিন তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অপমান, অবজ্ঞা, অবহেলার জীবন কাটাবো? মহান নেতা এম এন লারমা বলেছিলেন– 'আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কি জ্বালা, তা আমি বুঝাতে পারব না।' শাসকগোষ্ঠীর জাতি আগ্রাসী কার্যক্রম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করায় জুম্ম জনগণের বুকের মধ্যে নতুন মাত্রায় জ্বালা জাগিয়ে তুলছে। তাই বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাইচাপা আগুনের মতো রয়েছে। তাই শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে সুকান্ত ভট্টচার্যের কবিতার ভাষায় বলি–

আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়-
তা তো তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা তো জানো না;
কবে আমরা জ্বলে উঠব–
সবাই -শেষ বারের মতো।

পৃথিবীতে কারও কারও মৃত্যু জীবনকে অমরতা দান করে। তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা আলোর পথ দেখায়। ইতিহাসের পাতায় তাঁরা চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। তেমনি একজন জুম্ম জাতির অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমা। বিপ্লবী মহান নেতা এম এন লারমা আজ অধিকার বঞ্চিত সকল মানুষের চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে সশ্রদ্ধ স্থান করে নিয়েছেন। এ দিক থেকে আজ এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজে মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শ-চিন্তা-চেতনার ভিত্তি কত সুদৃঢ়।

আজ বহু পথ পরিক্রমায় জুম্ম জাতির সংগ্রামের পথচলা এখনো থেমে যায়নি, থেমে যাবার নয়, যদিও দিন দিন বহু ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্রের ইতিহাসকে পায়ে মাড়িয়ে এম এন লারমা একজন মহৎ কীর্তিমান নেতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। জুম্ম জাতির আত্মনিন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এম এন লারমার নেতৃত্বে যাঁরা লড়াই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এবং বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যাঁরা এখনও লড়ে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী। ১৯৯৭ সালে ২ রা ডিসেম্বর জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সৃষ্ট '৮৩ ঘাতকদের নব্য প্রেতাত্মা বিভেদপন্থী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এবং নব্য দালাল রূপায়ন-সুধাসিন্ধু সংস্কারপন্থী গংরা জুম্ম জাতির সমস্যা সঙ্কুল জীবনকে আজ এক দুর্বিষহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জুম্ম জাতীয় জীবনে ইউপিডিএফ নামক এক কালো জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে। তাদের অত্যাচার, নিযার্তনে জুম্ম জাতির আজ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা অন্যদিকে হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, বেপরোয়া চাঁদাবাজি, গুম ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। পক্ষান্তরে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখতে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফকে দুধ-কলা দিয়ে পুষে রেখেছে! অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের মদদে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ পার্বত্যাঞ্চলে ইসলামী মৌলবাদী অপশক্তির সাথে আঁতাত করে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনকে দুর্বল করার নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়– এই চুক্তিবিরোধী অপশক্তিও একদিন '৮৩ ঘাতক, বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো নির্মূল ও ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

সব কথার শেষ কথা হল– পার্বত্য জুম পাহাড়ে মহান নেতা এম এন লারমার স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে। জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জয়ের পতাকা উড্ডীন হোক। সকল গণতন্ত্রমনা অধিকারকামী জুম্ম জনগণের কাছে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শ্রদ্ধায় স্মরণীয় হয়ে আছে, থাকবে। আজ তাঁকে গভীর চেতনায় স্মরণ করছি। আর বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমতালিপ্সু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ নামক দানবদের ঘৃণাভরে ধিক্কার জানাই। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শই হোক আগামী দিনের সংগ্রামী লক্ষ্যের পেছনে ছুটে চলবার পথ আর পাথেয়, প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই এই বিপ্লবীকে।

চেতনার পথপ্রদর্শককে শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ চিংহ্লামং চাক ॥

১০ই নভেম্বর হচ্ছে জুম্ম জাতির জাতীয় শোক দিবস। বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে আমাদের মাঝে আসে ১০ই নভেম্বর। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন ১০ই নভেম্বর জুম্ম জাতীয় জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত প্রয়াত মহান নেতা এম এন লারমা আজ আমাদের মাঝে নেই বটে। কিন্তু তাঁর চিন্তা, চেতনা, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, নীতি-আদর্শ আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যায়নি। দেরিতে হলেও এখন জাতীয় পর্যায়েও এম এন লারমার মৃত্যুদিবস ১০ই নভেম্বর অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই এম এন লারমার চিন্তা-চেতনার আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মানুষ উজ্জীবিত হচ্ছে। কেননা এম এন লারমা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ও জুম্ম জাতির জন্য ভাবেননি। তিনি চেয়েছিলেন পৃবিবীতে মানুষের উপর মানুষের নিপীড়ন- নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা যেন না থাকে। তিনি চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না। তিনি চেয়েছিলেন গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার যেন প্রত্যেক সমাজে বজায় থাকে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

> এম এন লারমার স্বপ্ন ছিল দেশটি হবে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। দেশে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য থাকবে না।

এম এন লারমাকে আমার জীবনে দেখার সুযোগ হয়নি বটে। কিন্তু যখন বর্তমান পার্টি সভাপতি সন্তু লারমাসহ শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি নেতা ও কর্মীদের নিকট এম এন লারমার জীবনাচরণ ও নীতি-আর্দশের কথা শুনি এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংসদ অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যগুলো পড়ি এবং যখন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ পাঠ করি তখনই এম এন লারমার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, নীতি-আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতা পরিপূর্ণভাবে খুঁজে পাই।

এম এন লারমাকে যারা দেখেছেন এবং খুব ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন তাদের কাছ থেকে যে সব কথা শুনেছি সত্যি অবাক না হয়ে পারা যায় না। এত বড় একজন নেতা, অথচ তাঁর নিজের কাপড় চোপড় ধোয়া, প্যান্ট-শার্ট এর বোতাম লাগানো, বিছানা ও ঘর পরিষ্কার করা, থালা-বাসন পরিষ্কার করাসহ ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজও তিনি নিজেই করতেন। সব কাজ তিনি নিজেই সেরে নিতেন এবং জঙ্গলের শাক-সবজি, ফলমূল সংগ্রহ, ছড়ার মাছ সংগ্রহ ইত্যাদিও অতিরিক্ত নয়, প্রয়োজন অনুসারেই সংগ্রহের কথা বলতেন। কারো বাসায় গেলেও নাকি অগ্রিম খবর দিয়ে যেতেন না। কেননা অগ্রিম খবর দিলে গৃহস্থ অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তাঁর এই যে নিখুঁত চিন্তা-চেতনা ভাবতে অবাক লাগে। আরো শুনেছি তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন। হাতে বই ছাড়া থাকতেন না। যেদিকে যান সেদিকে ব্যাগে বই থাকবেই এবং সুযোগ পেলেই বই পড়তেন। সেই কারণে আমি খুব খেয়াল করি, বর্তমান নেতাসহ অধিকাংশ সিনিয়র নেতা ও কর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে প্রায়ই আত্মনির্ভরশীল আর মিতব্যয়ী থাকতে সচেষ্ট থাকেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত, বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ে যখন ভাবি এবং জুম্ম জাতির অস্তিত্বের ভবিষ্যত নিয়ে যখন উদ্বিগ্ন হই তখন এম এন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগ্রামের জীবন মনকে উজ্জীবিত করে। এম এন লারমার পূর্বেও অনেক জুম্ম নেতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার, তাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবং নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করা যায়, কিভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করা যায় এসব বিষয়ে পথ প্রদর্শক ছিলেন এম এন লারমা। আজ এম এন লারমা যদি না হতেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যদি গঠিত না হতো, আন্দোলন সংগ্রাম যদি না হতো তাহলে বোধহয় জুম্ম জাতি, সংগ্রাম, আন্দোলন, অধিকার, অস্তিত্ব শব্দটা মুখে উচ্চারণ করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়াতো। এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসমূহ স্ব-স্ব ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে মূলত এম এন লারমার আদর্শ, চিন্তা, চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এম এন লারমার স্বপ্ন মানে জুম্ম জাতির স্বপ্ন। দু-দশকের অধিক সশস্ত্র সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বটে কিন্তু চুক্তিটি যথাযথভাবে যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পার্বত্য

চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি দিন দিন নাজুক হয়ে উঠছে এবং জুম্ম জাতি আজও অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এম এন লারমার স্বপ্ন ছিল দেশটি হবে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। দেশে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য থাকবেন। সব মানুষের মৌলিক চাহিদা-শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত হবে। তার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিও স্ব-স্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতার আজ চার দশকে আমরা দেখি দেশ এখনও গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হতে পারেনি। তাই আজ প্রয়াত মহান নেতা এম এন লারমার বলে যাওয়া 'জুম্ম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের বিকল্প নেই' কথাটি বারবার মনে পড়ে। ১৪ বছর অতিবাহিত হলো তবু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি এবং এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ভূমিকাও মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা যেন এখনও স্বপ্নের মত। কিন্তু এম এন লারমার স্বপ্ন কখনও বৃথা হতে পারে না।

জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত অবিসাংবাদিত নেতা এম এন লারমার চিন্তা-চেতনা, নীতি-আদর্শ, উদ্দেশ্য- লক্ষ্য জুম্ম সমাজের ঘরে ঘরে যেদিন উজ্জীবিত হবে, আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার হবে, সংগঠন আরও আরও শক্তিশালী হবে, শাসক গোষ্ঠীর বিশেষ মহল কর্তৃক ব্যবহৃত সমস্ত কুচক্রী যখন নির্মূল হবে, সে দিন অবশ্যই এম এন লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে এবং সকল জুম্ম জনগণ স্ব-স্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে নিজের আত্মপরিচয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে এই পৃথিবীর বুকে।

এম এন লারমার চেতনা অপরাজেয়

॥ ধীর কুমার চাকমা ॥

১০ নভেম্বর ২০১২ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। প্রতি বছর ১০ নভেম্বরের এই দিনে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য শহীদ এম এন লারমা এবং তার সঙ্গে সকল শহীদদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও মহান নেতা এম এন লারমা আমৃত্যু জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ষাট দশকের জুম্ম ছাত্র যুব সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি দেখেছিলেন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। তাই তিনি মহান নেতা ও জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত।

> ’৮৩-এর সেই চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের প্রেতাত্মারা এখনো জুম্ম জাতীয় নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে সক্রিয় রয়েছে। ...আজকে ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী নামে ভিন্ন বেশে তাদের প্রেতাত্মারা অধিকতর অধিকার লাভের ফেরী করে বেড়াচ্ছে।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামল জুড়ে রাজনৈতিক অঙ্গণে জুম্ম বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ছিল না। চাকুরীজীবীদের মধ্যে প্রশাসনিক বিভাগে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা নেই বললেই চলে। যারা ছিল তারা অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজাত শ্রেণীর লোক এবং তারা রক্ষণশীল, আপোষমুখী ও প্রগতিবিরোধী ছিল। ফলশ্রুতিতে স্বাধীন রাজার যুগ শেষ হবার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক যুগের সঙ্গে তাল মিলাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্ব ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এমনি সময়ে একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সরল দৃষ্টিভঙ্গী অন্যদিকে এদেশের শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে বরাবর জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ’৭২ সালে প্রথম সংবিধানে এই জটিলতা সহজ সরল আদিবাসী জুম্ম জনগণকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করে। বলাবাহুল্য এম এন লারমা এই সশস্ত্র আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আন্দোলন করার জন্য নীতি আদর্শগত প্রশ্ন সর্বাগ্রে এসে যায়। উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেলে প্রয়োজন প্রগতিশীল চিন্তাধারা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে সামন্তবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উর্ধ্বে থেকে আদিবাসী জুম্ম জনগণকে সংগঠিত করতে হয়েছে। এম এন লারমা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সেভাবে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু সামন্তবাদী চিন্তাধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই জুম্ম সমাজ থেকে সরাসরি সেরকম বৈপ্লবিক গুণসম্পন্ন কর্মীবাহিনী এই আন্দোলনে সামিল হতে পারেনি। আর নিজেকে রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত করার ক্ষেত্রেও সমগ্র কর্মীবাহিনীর মধ্যে আত্মসচেতন হবার প্রক্রিয়া আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। তাই কর্মীবাহিনীর মধ্যে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী এক না হলে কর্মক্ষেত্রেও এক হবার কথা নয়। ১৯৮২ সালে পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। জাতীয় সম্মেলনে ফলতঃ বিভেদপন্থীরা উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করলো- ‘জাতি বড় নাকি আদর্শ বড়’? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে চার কুচক্রীরা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে আবিস্কার করেছিল ‘দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব’। এম এন লারমা পশ্চাৎপদ এই জুম্ম জাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ যুগ যুগান্তরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা একদিনে কাটিয়ে উঠা আদিবাসী জুম্মদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা ছাড়া বিকল্প পথ এই জুম্ম জাতির সামনে তখন খোলা ছিল না। এম এন লারমা আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সংগঠনকে ভিত্তি এবং বাইরের সাহায্যকে শর্ত বলে বিশ্বাস করতেন। এও বিশ্বাস করতেন যে, ভিত্তি শক্ত না হলে শর্ত সক্রিয় হয় না। অর্থাৎ দুর্বল পার্টি সংগঠনকে ঘরে-বাইরে কেহই গুরুত্ব দিতে চায় না। কাজেই নিজেরা সংগঠিত না হয়ে বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে আন্দোলনে জয়যুক্ত হওয়া যায় না।

কিন্তু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র ক্ষমতার লোভে মদমত্ত হয়ে মহান নেতার এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে দ্রুত নিষ্পত্তি তত্ত্ব পার্টিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আদর্শকে বাদ দিয়ে যে কোন কিছুর বিনিময়ে বিদেশের যে কোন রাষ্ট্রের সহায়তায় পার্বত্য

চট্টগ্রামের সমস্যা যতদ্রুত সম্ভব সমাপ্ত করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কার্যত চার কুচক্রী বিভেদপন্থীরা চেয়েছিল, তথাকথিত দ্রুত নিষ্পত্তির লেবাসে পার্টি থেকে এম এন লারমা ও সন্তু লারমাকে অপসারণ করা। কিন্তু বিভেদপন্থীরা জুম্ম জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও পরিশেষে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সে ভুল তত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছে। আর ১০ নভেম্বর '৮৩ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহান নেতা তার নির্ভুল তত্ত্বের প্রমাণ দিয়ে গেলেন। তিনি জুম্ম জনগণকে প্রগতিশীল আদর্শে সজ্জিত একটি পার্টি দিয়ে গেছেন। বর্তমান পার্টি সভাপতি সন্তু লারমার নেতৃত্বে সেই পার্টি আজো এম এন লারমার প্রদর্শিত নীতি আদর্শের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এম এন লারমার অবর্তমানে দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বর্তমান নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু '৮৩-এর সেই চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের প্রেতাত্মারা এখনো জুম্ম জাতীয় নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে সক্রিয় রয়েছে। '৮৩-এর বিভেদপন্থীরা তাড়াতাড়ি অধিকার প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছিল আর আজকে ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী নামে ভিন্ন বেশে তাদের প্রেতাত্মারা অধিকতর অধিকার লাভের ফেরী করে বেড়াচ্ছে। এই নব্য কুচক্রীরা পাখীর মতো হত্যা করছে অনেক দেশপ্রেমিককে। অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নস্যাৎ করে দিতে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আতাত করে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে দেশের স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে আঁতাত অন্যদিকে পার্টি ও জুম্ম জাতীয় নেতৃত্বকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সমূহ সকল ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। কুচক্রী সংস্কারপন্থীরা পার্টির বর্তমান নেতৃত্বকে উৎখাত করে '৮৩-এর কায়দায় পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখল করতে চায়। '৮৩-তে চার কুচক্রীরা আদিবাসী জুম্ম জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আজো একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে।

সেদিন মহান নেতা এম এন লারমা বিভেদপন্থীদের বিশ্বাস করে ক্ষমা করেছিলেন। দুঃখজনক অতীতকে ভুলে গিয়ে নুতন করে কাজে হাত দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমঝোতা হবে- এই মর্মে মহান নেতা এম এন লারমার কাছে খবরও পাঠিয়েছিল। তিনি খবর পেয়ে আশ্বস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিভেদপন্থীরা কথা রাখেনি। বরঞ্চ ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাকে নির্মমভাবে খুন করেছিল। ইহা কোনদিন ভুলে যাবার কথা নয়।

আদিবাসী জুম্ম জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমঝোতার কথা ভাবতে ভাবতে '৮৩'র ৯ নভেম্বর রাতে সেদিন এক বুক আশা নিয়ে অসুস্থ শরীরে শুয়েছিলেন মহান নেতা এম এন লারমা। আর জেগে উঠেননি। ঘাতকরা তাকে জেগে উঠতে দেয়নি। কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুমন্ত জাতি জেগেছে। তাঁর অনুসৃত পথ বর্তমান পার্টি নেতৃত্ব এবং আদিবাসী জুম্ম জনগণ ত্যাগ করেনি। '৮৩-এর শোককে শক্তিতে পরিণত করে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দোর গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। মানুষ অধিকার ছাড়া বাঁচতে পারে না। এম এন লারমার মহান আত্মত্যাগ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণকে সে শিক্ষা দিয়ে গেছে।

১০ নভেম্বর ২০১২ সাল মহান নেতা এম এন লারমার ২৯তম মৃত্যু দিবস ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস যাতে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হতে পারে দেশের সমমনা রাজনৈতিক নেতাকর্মী সবাই খবরাখবর রাখছেন। সেখানে নব্য বিভেদপন্থী ইউপিডিএফ ও সংস্কারবাদীরা পার্টি সংগঠনের নেতা নেতৃত্বকে অরাজনৈতিক ও অনৈতিক সমালোচনায় মেতে উঠেছে। মুখে সমঝোতার প্রস্তাব বাস্তবে আত্মহননের পন্থা জিইয়ে রেখেছে। সমমনা পার্ট সংগঠনের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী সংগঠন কিংবা উপদলীয় চক্রান্তকারীদের সাথে কোন সমঝোতার কথা অবান্তর। যারা আদিবাসী জুম্ম জনগণের সত্যিকার সেবক এবং দেশপ্রেমিক তারা জাতীয় স্বার্থে কাজ করবেন অন্যরা যারা আদিবাসী জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কাজে লিপ্ত তারা জুম্ম জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নেবেন; সেটাই হতে পারে আজকে সমঝোতার বিকল্প সমাধান। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সমঝোতার প্রস্তাব ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান এই অবস্থাকে পুঁজি করে জুম্মদের কিছু অংশ জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী জাতীয় দলসমূহের সাথে জড়িত হয়ে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী মহলের হয়ে কাজ করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে স্ববিরোধী ভূমিকা পালন করে থাকেন। এভাবে দুই দশক অধিককালের সংগ্রামের ফলে অর্জিত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা যায়; কিন্তু জুম্ম জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা যায় না। এদের দ্বারা জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন সুদূর পরাহত। একমাত্র সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেই জুম্ম জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার বিষয়ে আজকে মনোনীত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সদস্যবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু তারা পার্বত্য জেলা পরিষদকে নিজেদেরে স্বার্থে দলীয় পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করে প্রকারান্তরে চুক্তি বিরোধী ভূমিকা পালন করছেন। অথচ তারাই পারেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে শক্তিশালী করে তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চুক্তি অনুসারে উন্নয়ন কাজে সমন্বয় বিধান করতে। একই সঙ্গে যেসব চুক্তি বিরোধী চক্র সমতলে ও পাহাড়ে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সবাই-এর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। '৮৩ সালে জুম্ম জনগণ বিভেদপন্থীদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিল বলে তারা জনগণের কাছে ঠাই করতে পারেনি। সবশেষে আত্মরক্ষার পথ বেছে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছিল।

'৮৩ সালের চার কুচক্রীদের ক্ষমা করে মহান নেতা সমঝোতার প্রতি আশ্বস্থ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। আমরা সংখ্যালুঘু জাতি, ক্ষমাগুণ ছাড়া আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো না। এম এন লারমা

তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তার মরণোত্তর কালে তার হত্যাকারীদের হদিস পেয়েও তাদের শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। তারা বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন পার্টিও সেই মহৎ ক্ষমাগুণে মহীয়ান।

ষাট দশকের ছাত্র নেতা এম এন লারমা ৭০ দশকে জনপ্রতিনিধি হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শাসনতন্ত্র রদবদলের প্রতিবাদ করেছিলেন। চেয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের বিকাশোপযোগী শাসনতন্ত্র। তারই নিরিখে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর জুম্মদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে তা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাস্তবে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট উত্থাপিত চার দফা দাবি উপেক্ষিত হয়েছিল চরমভাবে। কিন্তু ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬২ সালে সর্বোপরি ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত কোন বিষয় পরিবর্তনের সময় এম এন লারমার মতো কেউ যদি সংসদে প্রতিবাদ করতে পারতেন তাহলে কিছু না হোক অন্তত পৃথিবী জানতো যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে অবিচার করা হচ্ছে। অতীতের সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে এম এন লারমা কর্তৃক ১৯৭২ সালে পেশকৃত ৪ দফা দাবিনামার ৪র্থ দফার মধ্যে বলা ছিল যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন যেন না করা হয় এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।'

জুম্ম যুবসমাজ ও জুম্ম জনগণের সম্মিলিত আন্দোলনের জোয়ার বইবে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজকের ১০ নভেম্বর আমাদের অর্থবহ করে তুলতে হবে। তখনই হবে মহান নেতা এম এন লারমার উদ্দেশ্যে যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তবতা প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আজ খুবই প্রণিধানযোগ্য যে- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সাক্ষরের জন্য দু' দশকের অধিক কাল সময় সংগ্রাম করতে হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনও দুর্বার গতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এম এন লারমার এই ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবসে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম তরুণ সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে অধিকতর সামিল হবে সেটাই আজকের বাস্তবতা দাবি রাখে।

দ্য স্কাই পিপল ডু নট লার্ন

॥ সঞ্জীব দ্রং ॥

'স্কাই পিপল কিছু শেখে না, তারা চোখে দেখে না।' এটি টাইটানিক ছবিখ্যাত জেমস ক্যামেরনের আরেকটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র এ্যাভটারের একটি সংলাপ। ছবিটির নায়িকা ওমাতিকায়া আদিবাসী প্রতিনিধি নিয়তিরি নায়ক জ্যাক সুলিকে কথাটি বলেছিল। তার আগে নায়িকার বাবা মি. মৌট নায়ক জ্যাক সুলিকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কেন এখানে এসেছ?'

জ্যাক সুলির উত্তর, 'আমি শিখতে এসেছি।'

মি. মৌট বললেন, 'আমরা অন্য স্কাই পিপলকে শেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। যাদের ভান্ডার আগে থেকেই পূর্ণ, তাদের শেখানো কঠিন (উই হেভ ট্রাইড টু টিচ আদার স্কাই পিপল, ইট ইজ হার্ড টু ফিল আপ এ কাপ দ্যাট ইজ অলরেডি ফুল)।'

জ্যাক সুলির উত্তর, 'আমার কাপ খালি, বিশ্বাস করুন, আমি শিখতে চাই।'

তারপর নায়িকার বাবা নায়ক জ্যাক সুলিকে বললো, 'ঠিক আছে। আমার মেয়ে তোমাকে আমাদের জীবনধারা শেখাবে। তুমি ভালো করে শেখো যদি তোমার মধ্যে বিদ্যমান অসুস্থ্য চিন্তা সুস্থ্য হয়।'

১.

রাঙামাটি শহরে যখন প্রথম আমি বেড়ানোর উদ্দেশ্যে যাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে নব্বইয়ের শুরুতে, তখন শহরের এক বৃদ্ধ পাহাড়ি আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।' আমি তখন সাপ্তাহিক খবরের কাগজে প্রতি সপ্তাহে 'আদিবাসী মেয়ে' কলাম লিখতাম। তাঁকে বললাম, 'বহু আগেই উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল, উঁরাও, মুন্ডা, মাহালীরা শেষ হয়ে গেছে। ওদের চেহারা বলে দেয় ওরা বিলুপ্তপ্রায় জাতিসত্তার প্রতীক। বৃহত্তর ময়মনসিংহেও বহু আদিবাসী দেশান্তর হয়ে গেছে সাতচল্লিশের পর। হাজং, ডালু, বানাই, হদি বিলুপ্তপ্রায়। আজ যারা আছে, তাদের সংগ্রাম করে টিকে থাকার চেষ্টা চলছে। নিজবাসভূমে ওরা সবাই এখন সংখ্যালঘু শুধু নয়, খোঁজে পাওয়াই কঠিন অনেককে। আপনাদের অবস্থাও এই পাহাড়দেশে আগামী কয়েকদশকে এদিকেই এগুচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে যে জনসংখ্যার অনুপাত ছিল পাহাড়িদের, পঞ্চশ বছর পর তা হয়ে যাচ্ছে উল্টো।' একই ধরনের কথা লিখেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী তার বিখ্যাত উপন্যাস টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা উপন্যাসের শেষের দিকে, 'আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোনো সংবাহন বিন্দু তৈরি করিনি আমরা। অনাবিষ্কৃত রেখেই ধীরে, সভ্যতার নামে ধ্বংস করেছি এক মহাদেশ। নো কম্যুনিকেশন। একেবারে নেই? সেটা গড়ে তোলা কি অসম্ভব? গড়তে হলে যে অসম্ভব ভালোবাসতে হয় বহুকাল ধরে। কয়েকহাজার বছর ধরে আমরা ওদের তো ভালোবাসিনি, সম্মান করিনি। এখন সময় কোথায়, শতাব্দীর শেষ সময়ে? সমান্তরাল পথ, ওদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবী আলাদা, ওদের সঙ্গেও কোনো প্রকৃত আদান-প্রদান হয়নি, যা আমাদের সমৃদ্ধ করতো।' তিনি আরো লিখেছিলেন, 'শোষণ' শব্দ তো হো ভাষায় নেই। যাদের জীবনে শুধুই শোষণ, শুধু বঞ্চনা, সেই আদিবাসীদের কোনো ভাষাতেই কি আছে 'শোষণ' শব্দের সমার্থক শব্দ? এক সময়ে বন ছিল, পাহাড় ছিল, নদী ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের গ্রাম ছিল, ঘর ছিল, জমি ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের ক্ষেতে আবাদ হতো, ধান, কোদো, কুটকি, সোমা, আমরা ছিলাম। তখন শিকার ছিল। বৃষ্টি হতো, ময়ূর নাচতো, আমরা ছিলাম। মানুষ বেড়ে যেত, সংসার বেড়ে যেত, আমরা কিছু মানুষ চলে যেতাম দূরে। পৃথিবীর কাছে বলে নিতাম, ঘর বাঁধতে খুঁটি পুঁতছি, চাষ করবো তাই জমি হাসিল করবো। আমাদের সমাজপতি বলে দিত কোথায় আমরা বসত করলে বাস করতে পারবো। সেইখানে বেঁধে নিতাম ঘর, গড়ে নিতাম গ্রাম, যে যার মতো জমি হাসিল করতাম। গাছ আমাদের গ্রাম দেবতা, গাছকে পূজা দিতাম। তখন আমরা ছিলাম, শুধু আমরা ছিলাম।...আর এখন? হায় হায়! বানের আগে যেমন পিঁপড়ে ওঠে, বর্ষার আগে যেমন উইপোকা ওড়ে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে, তেমনি করে আমাদের খবর চলে গেল ভিন মানুষের কাছে। আমাদের কি পূজা-পরবে কোনো ভুল হয়েছিল?...কেন এল ভিনদেশী মানুষ? আমরা রাজা ছিলাম, প্রজা হলাম। প্রজা ছিলাম, দাস হলাম। অঋণী ছিলাম, দেনাদার করে দিল। দাস করে বেঁধে রেখে দিল হায়! দেশ চলে গেল ঝড়ের মুখে, ধুলোর মতো চলে গেল জমি, ঘর, সব। যারা এল তারা তো মানুষ নয়। হায় হায়! পাহাড়ে গিয়ে ঘর বাঁধি, রাস্তা আমাদের তাড়া করে আসে। অরণ্য চলে যায়, চারদিক ওরা অশুচি করে দেয়। পূর্বপুরুষের সমাধি ছিল, হায় হায়! তা গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে সেখানে হলো পথ, বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল। এর কোনোটা আমরা চাইনি, আমাদের জন্যও করেনি। দুঃখে আমরা পাথর, আমরা বোবা। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, মুছে যাচ্ছি মাটি থেকে।'

এ্যাভটার ছবিতেও নায়ক জ্যাক সুলি ছিল মূলধারা সমাজের। তার গোত্রীয় লোকদের সে বলেছিল, ওমাতিকায়া সমাজে ওদের ভাষায়

'মিথ্যা' বলে কোনো শব্দ নেই (দে ডু নট ইভেন হেভ এ্যা ওয়ার্ড ফর লাই)। ওই আদিবাসীদের কাছে ধরিত্রী হলো জননী। সেখানে সবুজ বৃক্ষ, বন, বেঁচে থাকা, আলিঙ্গন, সম্পদ, পাখি ও মানুষ, প্রাণী, লতাপাতা সব জীবনের অংশ। অন্যপক্ষ হলো স্কাই পিপল, যারা হিসাব কষে বের করেছে ওই আদিবাসী জগতের এক কেজি পাথরের দাম ২০ মিলিয়ন ডলার। একদিকে জীবনের গল্প, অন্যদিকে মুনাফা ও লোভের লালসা। একপক্ষ জীবনের বিনিময়ে সব সম্পদ অনাগত প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চায়, অন্যপক্ষ দ্রুত দখল করতে চায়।

স্কাই পিপল, যারা হিসাব কষে বের করেছে ওই আদিবাসী জগতের এক কেজি পাথরের দাম ২০ মিলিয়ন ডলার। একদিকে জীবনের গল্প, অন্যদিকে মুনাফা ও লোভের লালসা। একপক্ষ জীবনের বিনিময়ে সব সম্পদ অনাগত প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চায়, অন্যপক্ষ দ্রুত দখল করতে চায়।

২.

বর্তমান সরকার আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নির্বাচনী ইশতেহার পড়লেও এসব পাবেন। এদের অনেকে যখন বিরোধী দলে ছিলেন, আদিবাসীদের সংগ্রামে রাজপথেও ছিলেন। তখন তাদের অনেকের সঙ্গে আমাদের ভালো যোগাযোগও ছিল। মানুষ যে এতটা বদলে যেতে পারে ক্ষমতার মোহে, তা আজ প্রত্যক্ষ করছি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এই আমলে আদিবাসীরা হঠাৎ করে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হয়ে গেল। এই প্রথমবারের মতো আদিবাসী দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা রাজধানীতে একটি পোস্টার দেখলাম। প্রেসক্লাব এলাকা পোস্টারে ছেয়ে গেল, 'আমরা আদিবাসী নই, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসাবে বাঁচতে চাই।' বোকারাও বুঝতে পারবে এ পোস্টার কারা বের করেছে। সরকার আদিবাসীদের মধ্যে এমনি বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল যে, অনেক জায়গা থেকে আদিবাসীরা আমাকে ফোন করেছেন আদিবাসী দিবস উদযাপন করা যাবে কিনা। সরকার পত্র জারি করে বলেছিল, বাংলাদেশে আদিবাসী নেই। আরেকটি স্পর্শকাতর পয়েন্ট সরকারি চিঠিতে যোগ করা হয়েছিল যে, আগস্ট মাস হলো শোকের মাস, এ মাসে অনাবশ্যক আনন্দ অনুষ্ঠান বর্জন বাঞ্ছনীয়। অথচ এক যুগের বেশি সময় ধরে আমরা আগস্ট মাসে আদিবাসী দিবস উদযাপন করছি জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী এবং সেই সব অনুষ্ঠানে আজকে যারা মন্ত্রী হয়েছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেকে আদিবাসী দিবসে এসেছেন এবং বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতার কপি ও ছবি আমাদের কাছে আছে। এখন দিন বদলে গেছে।

৩.

আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির কোনো উন্নতি কি হয়েছে? খাসি অঞ্চলে একটি ভূমি সমস্যার সমাধান কি হয়েছে এবং ইকো-পার্কের সময় যে অনিশ্চয়তা ছিল আদিবাসীদের, তা কি সামান্যতমও দূর হয়েছে? মধুপুর বনে মান্দিদের বহুবছরের ভূমি মালিকানা সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনাই তো হয়নি সরকারের সাথে। উত্তরবঙ্গে আদিবাসী হত্যাকাণ্ড হয়েছে বর্তমান সময়েই সবচেয়ে বেশি। এমনকি একই দিনে চার আদিবাসী শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে নওগাঁয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পনের বছর পূর্ণ হতে চলেছে। অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা এখনো প্রবল। তার প্রমাণ রাঙামাটি শহরে কিছুদিন আগের হামলা। সেখানে একটি পরিবর্তন প্রতিদিন সবার চোখে পড়বে, তা হলো, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের স্থলে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি বা বান্দরবান' লেখা সাইনবোর্ড। আগে পাহাড়ের মানুষেরা ছিলেন 'উপজাতি' এবং এখন তারা হলেন 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।' আবার পঞ্চদশ সংশোধনীর পর সংবিধানের ৬ক ধারায় যুক্ত হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ জাতিতে বাঙালি। কোনো জাতির আত্ম-পরিচয়ের অধিকার কি রাষ্ট্র বদলে দিতে পারে? বদলে দেয়া কি উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে? সংবিধান অনুযায়ী একজন গারো যদি 'জনগণ' হয়, সাঁওতাল, খাসি, হাজং, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা যদি 'জনগণ' হয়, তাহলে এরা কি বাঙালি? অথবা একজন বাঙালি কি গারো হতে পারে বা মুন্ডা হতে পারে? রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই কি এসব করতে পারে?

৪.

জেমস ক্যামেরনের চলচ্চিত্র এ্যাভটারের কয়েকটি ডায়ালগ দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। ফিরে যাই তার কাছেই। কেননা মূলধারার অনেকে এ ছবি দেখেছেন। আমি এ তথ্য জেনেছি গত কয়েকমাসে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে। শ্রোতারা অধিকাংশই তরুণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। বেশিরভাগই বাঙালি। তাদের জিজ্ঞেস করেছি, তারা এ্যাভটার ফিল্ম দেখেছেন কিনা। অধিকাংশই দেখেছেন এবং কেউ কেউ কয়েকবার করে দেখেছেন। একজন বললেন, ১০ বার দেখেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, ছবিতে একটি জাতির কথা বলা হয়েছে, ওরা কারা? খুব বেশি তরুণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। কয়েকজন পেরেছেন। ওরা ওমাতিকায়া জনগণ। তরুণদের আমি বললাম, আপনারা আবার যখন এ ছবিটি দেখবেন তখন একটু মিলিয়ে দেখবেন এ দেশের আদিবাসীদের সঙ্গে। দেখার মতো চোখ ও দৃষ্টিভঙ্গিও তো থাকা দরকার। ছবির নায়ক জ্যাক সুলি তো ওমাতিকায়া নয়, মেইনস্ট্রিমের প্রতিনিধি। তার মধ্যে মানবিকতা আছে। ছবিতে নায়ক জ্যাক বলছে, স্কাই পিপল খবর পাঠিয়েছে, তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে। কেউ তাদের থামাতে পারবে না। ঠিক আছে, আমরাও তাদের খবর পাঠাতে চাই, তারা যা ইচ্ছা তা কেড়ে নিতে পারে না। কেননা এটি আমাদের ভূমি।

এই ফিল্ম ঢাকাতে অনেকে দেখেছেন, মেইনস্ট্রিমের জনগণ। ছবিতে ওমাতিকায়া জনগণ যে আমাদের দেশের আদিবাসী জনগণের মতো, এরকম কেউই ভাবেননি। আমি অনেককে যখন

একথা বলেছি, তারা বলেছেন, ও তাই তো। এরা তো আদিবাসী ছিল।

ছবির নায়িকা নিয়তিরি যখন জ্যাককে বিপদ থেকে বাঁচায়, জ্যাক বলে, হুয়াই ইউ সেভড মি?

নায়িকা নিয়তিরি বলে, তোমার শিশুর মতো সুন্দর হৃদয় আছে, তুমি শিশুর মতো বোকা।

নায়ক জ্যাক বলে, আমি শিশুর মতো বোকা হলে তুমি আমাকে শেখাও, ইউ সুধ টিচ মি।

নায়িকা নিয়তিরি বলে, স্কাই পিপল ক্যাননট লার্ন, দে ডু নট সি (স্কাই পিপল শিখতে পারে না, তারা দেখে না)।

নায়ক জ্যাক বলে, তাহলে কিভাবে দেখতে হয়, আমাকে শেখাও (দেন টিচ মি হাউ টু সি)।

নায়িকা নিয়তিরি বলে, নো ওয়ান ক্যান টিচ ইউ টু সি।

শেষে নায়ক জ্যাক বলে, আমি তোমাকে দেখি (আই সি ইউ)।

শেষে মেয়েটিও বলে, আমি তোমাকে দেখি (আই সি ইউ)।

কবে কোন্ কালে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ বলবে, আমি তোমাকে দেখি। এ দেখার মানে কি একজন মানুষকে শুধু চোখের সামনে দেখা? নাকি এক গভীর মানবিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একজনকে দেখা? যারা চোখ থাকতে অন্ধ, তাদের এ কথা আমি কী করে বোঝাবো? তাই মন খারাপ হলেও আশাহত হই না। এ্যাভটার ছবির নায়ক জ্যাক সুলি তো ওমাতিকায়া আদিবাসী ছিল না, কিন্তু ওমাতিকায়াদের পক্ষে লড়েছিলেন। এখানে এ ভূমিতেও আমি জ্যাক সুলির মতো অনেককে দেখি, আদিবাসীদের বেদনায় ব্যথিত হন, পাশে দাঁড়ান। এদের সঙ্গে নিয়েই অনেকদূরের কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের।

শেষে পাহাড়ি আদিবাসী তরুণ বন্ধুদের প্রতি আহ্বান জানাই যারা সংখ্যায় এখন অনেক এই ঢাকা শহরে। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি পঁচাশি-ছিয়াশি সেশনে, তখন সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে ওই ব্যাচে আমি একা ছিলাম। আমি কোটায় ভর্তি তো দূরের কথা, ভর্তি পরীক্ষায় 'ঘ' ইউনিটে মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলাম। এই ইউনিটের যে কোনো বিভাগে ভর্তি হতে পারতাম। কিন্তু ভর্তি হয়েছিলাম এ্যাকাউন্টিংয়ে যেখানে মেধা তালিকায় ১১৩ তম হয়েছিলাম। এখনকার ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই আদিবাসী কোটায় ভর্তি হয়। অর্থাৎ আদিবাসী হওয়ার কারণে তারা ভর্তির সুযোগ পায়। তাহলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কত বেশি হতে পারে সমাজের জন্য? অস্ট্রেলিয়ায় বৃত্তি নিয়ে যারা যাচ্ছেন, তারা কি ওই এ্যাভটার ফিল্মের ওমাতিকায়াদের মতো ভাববেন? এ ভূমি আমাদের এবং তা রক্ষার লড়াই করে যেতে হবে। মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ও বন্ধুরা সেই যুগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ছেড়ে শিক্ষকতা পেশায় চলে গিয়েছিলেন গ্রামে। আমরা আজো তাদের কথা বলি। যারা থেকে গেছেন শহরে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ সন্ধানে, তাদের কতজনের নাম আমরা জানি? আজ আমাদের তরুণ আদিবাসী বন্ধুদের আমি জীবনের প্রকৃত মানে খুঁজে নিতে বলি।

এইসব পাকিস্তানী বুদ্ধি কে দেয়?

॥ মুনতাসীর মামুন ॥

১৬১০ সালে খুব ঘটা করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় পদার্পণ করলেন। ঘোষণা করলেন, এখন থেকে ঢাকা হবে বাংলার মুঘল রাজধানী। এবং এ নগরের নাম হবে জাহাঙ্গীরনগর। মুঘল আমল তো কাগজে কলমে অষ্টাদশ [উনিশও] শতক পর্যন্ত ছিল। জাহাঙ্গীরনগর নামটি কেউ উচ্চারণও করেনি। খালি দরবারি ঘোষণার বা দলিলপত্রে নামটি ছিল। শাখারি বাজারের নাম ১৯৭১ সালে রাখা হয়েছিল টিক্কা খান রোড। ঐ মরণপণ সময়েও বাঙালি ঐ নাম উচ্চারণ করেনি। 'আদিবাসী' বিতর্কে হঠাৎ এ ঘটনাগুলো মনে পড়ল। বাঙালি জাতিগোষ্ঠী থেকে যারা আলাদা তাদের যে নামেই ডাকুন, তারা স্বতন্ত্র সত্তা। বাঙালি নয়। এবং তাদের বাঙালি করার দরকার নেই। যেমন, বাঙালিদের জাতিসত্তা বদল কি বাঙালি বা সরকার পছন্দ করবে? নামে কিছুই আসে যায় না।

বাঙালিদের থেকে যারা আলাদা বা আলাদা জাতিসত্তা তাদের সরকারি নাম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি। বাঙালিদেরও বলা যেতে পারে বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী, বৃহৎ জাতিসত্তা ইত্যাদি। তাতে কি বাঙালিদের চরিত্র বদল হবে?

নিশ্চয় আওয়ামী লীগের কাছের কেউ যাদের পান্ডিত্য আওয়ামী লীগে শুধু স্বীকৃত, তারা ঠিক করেছে, বাঙালিরাই আদিবাসী। 'আদিবাসীরা' নয়। আক্ষরিক অনুবাদ এ ক্ষেত্রে অচল, এটি তাদের বোধের মধ্যে আসেনি। বাঙালিরাই আদিবাসী? কিন্তু বাঙালি তো শঙ্কর জাতি। এ ভূখণ্ডে যারা আগে ছিল তারা কি খাঁটি বাঙালি ছিল– এ প্রশ্নটি কিন্তু থেকে যায়। যাক, সে তর্কে যাব না। এই যে বদল এর পেছনে এক ধরনের মতলববাজি তো আছেই, এটা বোঝার জন্য পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। সাংবিধানিক সংশোধনের পর সরকারি মন্ত্রী ও আমলারা নিষ্ঠার সঙ্গে বলছেন বাংলাদেশে আদিবাসী নেই। এ কথা যারা শোনে, তারাই হাসে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বাইরে এরা স্বতন্ত্র সত্তা। কমবেশি সব দেশেই স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী আছে। শাহরিয়ার কবির ভুল লেখেননি যে, 'জাতিগত পরিচয়ের বাইরে এরাও কোথাও আদিবাসী, গিরিজন, বনবাসী, কোথাও জনজাতি, কোথাও ট্রাইবাল, কোথাও এ্যাবরিজিনাল, কোথাও ইনডিজিনাস, কোথাও এথনিক মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বা সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠী, কোথাও ন্যাশনাল মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা।' [জনকণ্ঠ ৯.৮.১২] সরল বাংলায় আমরা এদেরই আদিবাসী বলে আখ্যা দিয়েছি এবং আদিবাসী বললে এমন কী উপজাতি বললেও এই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেহারাই ভেসে ওঠে।

এতদিন শব্দ নিয়ে বিতর্ক চলছে। আদিবাসী নেই একথা বলা হয়েছে। আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে জাতিসংঘ যার চারটি উপাদান আছে। সে সংজ্ঞায় বাংলাদেশে আদিবাসী আছে। সুতরাং নেই বললেই হয় না। বাংলাদেশে এর সংখ্যা ৪৫টি এবং জনসংখ্যা প্রায় বিশ লাখ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালে ঘোষণা করেছে প্রতিবছর ৯ আগস্ট 'বিশ্বের আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দিবস'। গত বছরও বাংলাদেশে তা পালিত হয়েছে। সরকারও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। এ বছর ঘোষণা করা হলো, আদিবাসী দিবস পালন করা যাবে না। কারণ বাংলাদেশে তো আদিবাসীই নেই। বির্তকের শুরু সেখান থেকেই।

পত্র-পত্রিকায় পড়েছি এবং বিভিন্ন জনের কাছে শুনেছি এ পরার্মশ নাকি আমাদের সেই বিখ্যাত ডিজিএফআইয়ের, যা পাকিস্তনের আইএসআইয়ের মতো কুখ্যাতি অর্জন করছে। মূল ম্যাজেজটা হলো অর্থাৎ তাদের চিন্তাধারা যাকে পাকিচিন্তাও বলতে পারি তা'হলো, যদি পৃথক সত্তা হিসেবে এদের স্বীকার করা হয় তা'হলে জাতিসংঘ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে আদিবাসীদের। এদের বাড় বাড়বে এবং একসময় স্বায়ত্তশাসন চাইবে। চাই কি স্বাধীনতাও চাইতে পারে। শোনা যায়, ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষী [এ পদ প্রধানমন্ত্রী যে সৃষ্টি করবেন না কে না জানে] কিছু মন্ত্রীও সর্বতোভাবে মিলিটারি বুদ্ধি সাপোর্ট করেছেন। এ সব বুদ্ধি পাকিস্তানী বুদ্ধি। সেনাবাহিনীর মাইন্ড সেট পাকিস্তানী। কিছু নেতা/মন্ত্রীরও তাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা হলো কেন? একটু পটভূমিটা স্মরণ করুন। পাকিস্তানী বুদ্ধির কারণেই তো যাকে বলা যায় কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি।

পাকিস্তানীমনা জেনারেল জিয়া সৈন্যবাহিনী দিয়ে, সেটেলার দিয়ে পাকিদের মতো দমন করতে চেয়েছিলেন পাহাড়। বাংলাদেশে বৃহৎ সেনাবাহিনী রাখার অজুহাতও ছিল তা। কোন লাভ হয়নি। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় গিয়ে সেই পাকি ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। শান্তিচুক্তি করলেন। এই প্রথম বিশ্বে শেখ হাসিনার একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। ৬৩টি দেশসহ জাতিসংঘ অভিনন্দন জানিয়েছিল। পাহাড়ে অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ কমে গিয়েছিল। পাহাড়ের বন উজাড় করে আমলাদের বাড়িঘরে কাঠ ব্যবহার ও বিক্রি হ্রাস পেয়েছিল। শান্তি ফিরে এসেছিল। উৎপাদন বেড়েছিল যা দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তা পছন্দ হয়নি। তখন থেকে নানা অজুহাতে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন বন্ধ রাখা হয়েছে, বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে। এবং সরকার তাতে পা দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রথম আমলে শেখ হাসিনা যে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখিয়েছিলেন এখন কেন যেন তাতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে যা বলা হয় তা আর লিখলাম না। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট করেছেন যেখানে লুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহ [আদিবাসীদের] সংরক্ষণের উদ্যোগ

নেয়া হবে। সেই শেখ হাসিনার সরকার কীভাবে নির্দেশ দেয় আদিবাসী দিবস পালন করা যাবে না?

সরকারের এই সিদ্ধান্ত একটি কুসিদ্ধান্ত, নিন্দা করার মতো সিদ্ধান্ত। নিশ্চয় বিরোধীদের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আদিবাসীদের জন্য কাজ করে যে অর্ঘ্য পেয়েছিলেন তা ছুড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছেন কেন? এই আমলে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিএনপির ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। তার ওপর এই ধরনের ঘোষণা। বিশ লক্ষ মানুষ বা ভোটারকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে কার লাভ হলো? দেশের মানুষদের একটি বড় অংশও ক্ষুব্ধ একমাত্র বিএনপি ছাড়া, জামায়াত ছাড়া, কারণ তারা খুশি। তারা যা চাচ্ছে, সরকার তা করছে। মাননীয় আইনমন্ত্রী যেমন আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন, যুদ্ধাপরাধ বিচারে যে অবকাঠামো [১৩ জন কর্মচারী, দুটি ট্রাইব্যুনালে] তা মাত্রাতিরিক্ত। মন্ত্রীর যুক্তি তো নিশ্চয় সবার থেকে উপরে, না হলে তিনি মন্ত্রী কেন। মাননীয় মন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী সচিবের জনবলের চেয়ে বেশি। বিচারের যে প্রক্রিয়া চলছে তা তো দেখছেনই। জামায়াতীরা খুব খুশি। এখন আরো খুশি পাহাড়ি/আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও সরকার তাদের নীতিই অনুসরণ করছে। আর সরকারি দলই তো বলে বিএনপি-জামায়াতীরা পাকিদের অনুসারী।

গোয়েন্দারা আরেকটি পরামর্শ নাকি দিয়েছে যা সরকারই পালন করছে তা হলো, জাতীয় শোক দিবস সুতরাং এ সময় আদিবাসী দিবস পালন করা ঠিক নয়। খুশির খবর ৪০ বছর পর সেনাবাহিনীর শোক উথলে উঠছে জাতির পিতার প্রতি। তারা বুঝে গেছে যে, প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতে হলে তার মন নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কী বলতে হবে। এ ধরনের পরামর্শ সেনারা প্রায়ই দিয়ে থাকে। আমার সাংবাদিক বন্ধু শফিকুর রহমান একটি লেখায় চমৎকার এক মন্তব্য করেছিলেন, তা হলো, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, মইনউদ্দিন আহমদ আমাদের কিছু জিনিস শিখিয়েছেন তা হলো সুশাসন মানে, চুল ছোট করতে হবে, গাছের গোড়ায় রং করতে হবে। দালান কোঠায় রং করতে হবে আর রাজনীতিবিদ পেলেই বদমাশ বলে জেলে ঢোকাতে হবে, সিভিলিয়ান সবাইকে দুর্নীতিবাজ বলতে হবে আর নিজেদের পদপদবি বেতন-ভাতা, ডিওএইচএসের সীমানা বাড়াতে হবে। এতবড় একটা জাতিকে চুল কাটানোর একটা পারিশ্রমিক আছে না! দুর্ব্যবহারের একটা মূল্য আছে না। তাদের এই পরামর্শটা সেরকম। জাতির পিতাকে তো সিভিলিয়ানরা খুন করেনি। খুনীদের তোয়াজও সিভিলিয়ানরা করেনি। আমরা যেন জানি না এটি শোকের মাস বা ১৫ আগস্ট শোক দিবস। লোক দেখানো শোক দিবস পালন জাতির পিতার অবমাননাই। এ ধরনের পরামর্শ ঐ ক্যাটাগরিতেই পড়ে। শোকের মাসের অর্থ এই নয় যে, এ মাসে জনজীবন বা আমাদের জীবন স্থবির হয়ে যাবে। বা স্থবির থাকতে হবে। যারা এসব লোক দেখানোর বুদ্ধি দিচ্ছেন তারা কি তাদের পিতামাতার মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর চেয়ে কম শোকাহত হয়েছিলেন? নাকি পিতামাতার মৃত্যুর পর বিয়েশাদী করেননি। চাকরি বাকরি করেননি? শেখ হাসিনার চেয়ে দুঃখী মানুষ তো বাংলাদেশে কেউ নেই। সেই দুঃখী মানুষটির কি জীবন একেবারে স্থবির হয়ে গিয়েছিল নাকি তিনি শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন?

১৫ আগস্ট কি খালেদা জিয়া জন্ম দিবস পালন করবেন না? ডিজিএফআই পারবে নাকি তা বন্ধ করতে? আজ ৯ আগস্ট জ্বালানি দিবস পালিত হচ্ছে সরকারিভাবে, কেনো? জন্মাষ্টমীর মিছিল বেরুবে আজ। সামনে ঈদ। পারবে মহাপরাক্রমশালী ডিজিএফআই ও মহাপরাক্রমশালী মন্ত্রীরা তা বন্ধ রাখতে। দেখি পারে কিনা এই বীর পুঙ্গবরা?

সমস্যা হচ্ছে আমরা যা না তা ভাবি নিজেদের সম্পর্কে। এটি হচ্ছে পাকিস্তানী মাইন্ড সেট। মুঠোফোনের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশ গরিব জনসংখ্যার ভারে যে দেশ ডুবু ডুবু সে দেশ যদি ভাবে তারা পৃথিবীর পরাক্রমশালী কেউ তা'হলে তো মুশকিল। তাদের ইচ্ছেমতো তারা স্বীকৃত বিষয় বদলাতে পারে তা'হলে তো ঐ সব কুশীলব থেকে দূরে থাকা শ্রেয়। জাতিসংঘ থেকে এত সুবিধা নিয়ে জাতিসংঘের দিবস না পালন খুব সুবুদ্ধির নয়। এত শক্তিশালী হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ড. ইউনূসের ব্যাপারে এত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হয় কেন? খুব বেশি জাত্যাভিমান ভাল নয়। জাত্যাভিমান ফ্যাসিবাদ নাজীবাদের জন্ম দেয়। ২০ লক্ষ মানুষ তাদের মতো থাকতে চাইলে সেই স্পেস দেয়াটাই সভ্যতা সংস্কৃতি। না দেয়াটা অভব্যতা অসংস্কৃতি।

২০ লক্ষ লোক যদি আদিবাসী হিসেবে পরিচিত হতে চায় তাতে কী এমন অসুবিধা? কেন এমন গাত্রদাহ? ২০ লক্ষ মানুষ [তখন বোধহয় আরো কম] তো কয়েক শ' বছর আপন মনে বসবাস করছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধেও ছিলেন, আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়েছেন। তাদের খানিকটা সুবিধা দিলে কি বাঙালির ভাঁড়ারে টান পড়বে? এগুলো কী ধরনের মনোভাব? পাকিস্তান এসব করে আজ ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস পালিত হলো ভবিষ্যতেও হবে, কেউ কিছুই করতে পারবে না। সবাই সরকারি চাকর না। যে সরকার যা বলবে তাই বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে হবে। স্পীকার তো বলেছিলেন, সাংসদ নয়, সংসদ সদস্য বলতে হবে। আমরা বা মিডিয়া তো তা বলছি না। স্পীকার কী করতে পেরেছেন? আদিবাসীর সংজ্ঞা দেয়া ছাড়া দেশে আরও অনেক গুরুতর সমস্যা আছে সরকারি নীতি নির্ধারকদের কি তা অজানা? যাদের আমরা শিক্ষিত বলে জানি, জনসংলগ্ন বলে শ্রদ্ধা করি তারাও কি মন্ত্রী মর্যাদা পেলে অশিক্ষিত হয়ে যান, জন-সংলগ্নতা হারান? আজ সরকার এ কাজটি না করে বরং যদি এতে পৃষ্ঠপোষকতা করত তা'হলে নিজের মান বাড়ত, ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো দলের ভোট বাক্স সমৃদ্ধ হতো। সে সুযোগ গেল। বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস বাংলাদেশ পালন করতে পারে আর আদিবাসী দিবস পালন করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার একটি কথা খুব ভাল লাগল। ৮ আগস্ট তিনি বলছিলেন, সঙ্কটময় সময়ে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা কখনও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। গত এক বছরে তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বক্তব্যটি কত সঠিক।

গত এক বছরে অকারণে সরকার কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা তাদের পক্ষে যাচ্ছে না। কেন নিচ্ছে তাও জানি না। গোয়েন্দা নির্ভরতা অতীতে সব সরকারের পতন ডেকে এনেছে। বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাইন্ডসেট যখন পাকিস্তানী। দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগ নেতারা এত ইতিহাসের কথা বলেন, ইতিহাস থেকে কেন শিক্ষা নেন না?

প্রকাশিত: দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ আগস্ট ২০১২।

চেনা জগত জানা কথা

পাকিস্তানের পরিণতির দিকে অভিযাত্রা!

॥ মুনীরুজ্জামান ॥

৯ আগস্ট ছিল আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। জাতিসংঘ দিবসটির পৃষ্ঠপোষক হলেও বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের মতোই দিবসটি সরকারিভাবে পালন করেনি। শুধু যে পালন করেনি তা নয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যেন সরকারিভাবে কোন সহযোগিতা না করা হয় তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনাও দেয়া হয়। সরকারের বহু নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত না হলেও এই নির্দেশটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় প্রশাসনের সর্বস্তরে। অন্তত তিনটি স্থানে আগ বাড়িয়ে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান পালনে রীতিমতো বাধাও দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে নিবর্তনমূলক এবং নির্যাতনমূলক নির্দেশগুলো পালনের জন্য আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অতি উৎসাহী বা হাইপার-অ্যাক্টিভ থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠান করতে না দেয়ার লক্ষ্যে উৎসাহী হওয়ার পেছনে আরও গূঢ় কারণ রয়েছে, সেটা ক্রমশ জানা যাবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের নির্দেশনামূলক চিঠি পাঠানো হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে। চিঠিতে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের কোন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া এবং কোন সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এ দেশে কোন আদিবাসী নেই। আগস্ট মাস জাতীয় শোকের মাস, তাই এ মাসে আদিবাসী দিবসের নামে অপ্রয়োজনীয় আনন্দ অনুষ্ঠান পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।' (প্রথম আলো ০৮-০৮-২০১২) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকদের কাছে একই নির্দেশ দিয়ে সার্কুলার পাঠায়। এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোতে প্রকাশিত উল্লিখিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সরকারি সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের চিঠি প্রকাশের আগে একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পরও গণমাধ্যমে এবং বিভিন্ন সভা, সেমিনার, বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা চলতে থাকলে সংবিধানবহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এক সময় আদিবাসী শব্দটি প্রচলিত হয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে তা আবার সংবিধানে যুক্ত করার দাবিও উঠতে পারে।'

অন্য কোন কিছু আলোচনার আগে 'ভবিষ্যতে তা আবার সংবিধানে যুক্ত করার দাবিও উঠতে পারে' সম্পর্কে বলতেই হয়, ভবিষ্যতে কেন, এখনই এই দাবি করছি আমরা যে অবশ্যই আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে শব্দটি সেইভাবে যুক্ত করতে হবে। শুধু তাই নয় উল্লিখিত গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে যে পঞ্চদশ সংবিধানের কথা বলা হয়েছে, সেই পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বেই এদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তি আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার দাবি করেছে এবং এখনো করছে। সুতরাং শব্দ বা দাবিটি নতুন করে প্রচলিত হওয়ার কিছু নেই, এ দাবি ও শব্দ প্রচলিত হয়েই আছে। এ ধরনের গোয়েন্দা রিপোর্ট কি সরকারকে উসকে দেয়ার জন্য করা হয়েছে না সরকারকে ডিকটেট করার জন্য?

প্রশ্ন হলো এই গোয়েন্দা সংস্থা কোনটি আর তাদের ইন্টারেস্ট কী শুধু সংবিধান রক্ষা করা না অন্য কিছু? এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার আগে আমাদের দেখা জানা উচিত ২০০৮ সালের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কী প্রতিশ্রুতি দেয়া ছিল আদিবাসীদের সম্পর্কে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮.২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।' ইশতেহারে 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চল' শীর্ষক অনুচ্ছেদেও 'আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতন অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।' এই যে দলের নির্বাচনী ইশতেহার সেই দল কীভাবে সরকারের দায়িত্ব পাওয়ার পর আদিবাসী বিরোধী নীতি গ্রহণ করল? এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন।

আদিবাসী প্রশ্নে আওয়ামী লীগের অ্যাবাউট টার্ন কি দলটির সুচিন্তিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, না কোন বিশেষ কোন গোষ্ঠী অথবা মহলকে খুশি করার জন্য বা তাদের নির্দেশে অথবা ডিকটেটে করেছে? এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব বর্তমান সরকারের চরিত্র নির্ধারণ করবে।

আদিবাসী প্রশ্নে মহাজোট সরকারের অবস্থান পাল্টানোর কারণ সম্পর্কে সরকারি সূত্রগুলো জানায়, জাতিসংঘ আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণে কিছু অবশ্য পালনীয় শর্তারোপ করেছে। কোন দেশ এই শর্তগুলো পালন না করলে শান্তিরক্ষী মিশনসহ জাতিসংঘের বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ডে ওই দেশের অংশগ্রহণ বিঘ্নিত হতে পারে। কাজেই যদি দেখানো যায় যে এ দেশে কোন আদিবাসী নেই, তাহলে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বা অধিকার প্রতিষ্ঠার ওই সব শর্ত পূরণের প্রশ্ন থাকে না। এ কারণে সরকার বলছে, এ দেশে কোন আদিবাসী নেই। (প্রথম আলো-০৮-০৮-১২) এই প্রতিবেদন যদি সঠিক হয় তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে সরকার বিশেষ একটি গোষ্ঠীর স্বার্থেই আদিবাসী প্রশ্নে ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দেশকে আবার সংকটের মুখোমুখি করছে।

এখন আওয়ামী লীগের আদিবাসী বিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে খোদ মহাজোটেই অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পার্টনারদের মধ্যেই মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের এক সভায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে এবং আদিবাসী শব্দটির বদলে 'উপজাতি' এবং 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' শব্দ ব্যবহার করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী করার ফলে সরকারের সমালোচনা করেছেন মহাজোট সরকারেরই কয়েকজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য। এই সভায় জাতীয় সংসদ সদস্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান বলেছেন, 'রেডিও-টেলিভিশনের সাংবাদিকদের ডেকে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা বাহিনী এমন কাজ করতে পারে না।' (প্রথম আলো ০৭-০৮-১২)।

মাননীয় সংসদ সদস্য বলেছেন, একটি দেশের নিরাপত্তা বাহিনী এমন কাজ করতে পারে না। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে যাওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে বেইমানি করেছে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উদ্বুদ্ধ হয়ে আদিবাসী দিবস পালনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বর্তমান মহাজোট সরকার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কোন সরকারই আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান পালন করেনি। বর্তমান মহাজোট সরকার সেটা করেছে এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে। এরপরও কি আমাদের বলতে হবে এই সরকার আসলেই তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র ধরে রাখায় সচেষ্ট? সরকারের চরিত্র কি পাল্টে যাচ্ছে না?

গোয়েন্দা রিপোর্টে 'আদিবাসী' শব্দটিকে অসাংবিধানিক বলে এর ব্যবহারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গোয়েন্দা সংস্থাটি। কিন্তু সেই পঞ্চদশ সংশোধনীতে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বেইমানি করা হলো তখন কি এই গোয়েন্দা সংস্থাটি উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারকে চিঠি দিয়েছিল? আমরা জানি দেয়নি। অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের প্রধান একটি ভিত্তি ছিল, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ছিল '৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনার প্রধান একটি অংশ এই ভিত্তি আর চেতনার সঙ্গে যখন পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো তখন কোন গোয়েন্দা সংস্থা সরকারকে 'সতর্ক' করে দিয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই।

আসলে পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যদিয়ে মহাজোট সরকার যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে পিছিয়েছে, তেমনি পাকিস্তানি চেতনার দিকে অগ্রসর হয়েছে। যে কাজটি করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেই কাজটিই করা হলো বঙ্গবন্ধু কন্যার মহাজোট সরকারের নেতৃত্বে। এখন দেখা যাচ্ছে, মহাজোট সরকার শুধু রাজনৈতিক-সাংবিধানিকভাবেই পাকিস্তানি চেতনার দিকে মার্চ করেনি, সরকার পরিচালনায়ও পাকিস্তানকেই অনুসরণ করছে। তা না হলে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং দৃশ্যত সেনাবাহিনীর আপত্তির কারণে দেশ থেকে অন্তত সাংধিানিকভাবে আদিবাসীদের নির্মূল করে ফেলেছে।

সেনাবাহিনীর শাসনে দেশের কী অবস্থা হতে পারে সেটা এই দেশ ১৯৫৮, ১৯৬৯, ১৯৭৫ এবং ১৯৮১, ১৯৯০-এ আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, মোশতাক-জিয়া এবং এরশাদ আমলে দেখেছে। আর সেনা কর্তৃত্বে এবং সেনা নির্দেশে ১৯৪৭ সাল থেকেই চলার কারণে পাকিস্তান এখন শুধু ব্যর্থ রাষ্ট্রই নয় অস্তিত্ব সংকটেও পড়েছে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি বিশ্ব মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হবে কিনা সেটা এখন আর প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে কবে হবে? আর এসবই হয়েছে পাকিস্তানে সেনা শাসন, সেনা কর্তৃত্বের শাসন এবং সেনা পরামর্শে শাসনের কারণে? প্রশ্ন হচ্ছে সরকার নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশও কি সেই পথে চলছে? বা বাংলাদেশকে সেই পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে? এখন কারা রাষ্ট্র চালাচ্ছে রাজনৈতিক সরকার, না অরাজনৈতিক শক্তি? সরকার কার নিয়ন্ত্রণে?

এসব সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শ বা ডিকটেট যে পাহাড়কে আবার অশান্ত করার ইন্ধন জোগাচ্ছে এবং পাহাড়ে একটি স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠেলে দেয়া হচ্ছে আদিবাসীদের আবার লড়াই-সংগ্রামের দিকে। ৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের সমাবেশ থেকে সেই আহ্বানই জানিয়েছেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতা সন্তু লারমা। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী নিজ থেকে পাহাড়িদের অধিকার নিশ্চিত করবে না। অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।' ১০ আগস্টের সব কয়টি জাতীয় দৈনিকে তার এই আহ্বান বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো রাজনৈতিক সরকার এবং রাজনৈতিক সরকারের অরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকারীরা কি ভেবে দেখেছেন তারা সন্তু লারমাদের কোথায় ঠেলে দিচ্ছেন? দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? রাজনৈতিক সরকার অরাজনৈতিক কর্তৃত্বে চললে যে পরিণতি হয়েছে পাকিস্তানের, সেই পরিণতির দিকে কি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে?

প্রকাশিত: দৈনিক সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০১২।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী

॥ শক্তিপদ ত্রিপুরা ॥

সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্র একসাথে থাকতে পারে না। যে রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত, সে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নাজুক অবস্থায় নিপতিত হতে বাধ্য। আজ বাংলাদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির আস্ফালন। যারা সাম্প্রদায়িক হামলার পরিকল্পনা করছে ও বাস্তবায়ন করছে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুনোপুঁটিরাই ধরা পড়ছে ও জেল-জুলুম খাটছে। ঘটনার মূল হোতারা বার বার পার পেয়ে যাচ্ছে। দেশে একদিকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির আস্ফালন, অপরদিকে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত ও পযুর্দস্ত। আক্রান্ত দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। গত কয়েকমাস ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও নিপীড়নের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামু, উখিয়া ও টেকনাফের বৌদ্ধ পল্লীতে পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মন্দির, তালপাতায় লেখা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও ঐতিহ্য। এ হামলায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বাসে, ট্রাকে করে লোক আনা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে গান পাউডার। এসব কর্মকান্ড প্রমাণ করে যে, এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা করার জন্য সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী গোষ্ঠীর পূর্ব প্রস্তুতি ছিলো এবং এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক কাজ করেছে যাদের আর্থিক ও সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে।

রামুর ঘটনার আগে ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এ হামলায় পাহাড়িদের ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক, দোকানপাট ও অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আক্রমণ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও রেস্টহাউস। এ হামলায় ১ জন সরকারি চিকিৎসক, ১৪ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও ১ জন সংবাদদাতাসহ শতাধিক পাহাড়ি, ৩ জন কলেজ শিক্ষক ও ৯ বাঙালি আহত হয়। হামলাকারীরা সরকারি চিকিৎসক সুশোভন চাকমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার পর মৃত মনে করে ঘটনাস্থলে রেখে যায়। উল্লেখ্য যে, রামু ও রাঙ্গামাটির ঘটনার আগে হাটহাজারী, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছিলো। ভাঙচুর করা হয়েছিল তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি।

ইদানীং কালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কিছুটা ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা যাক। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ দ্বিখন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হলো। নির্ধারিত হলো 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আর 'ভারত' হিন্দু ও অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য। বৃটিশ সরকারের 'ভাগ করে শাসন করা' নীতির অনিবার্য পরিণতি হলো ভারত উপমহাদেশে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে একটি দেশ স্বাধীন করা যায় বটে, তবে সে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যায় না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম।

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন আমরা লক্ষ্য করলাম জন্মের পর পরই। শিক্ষা, চাকরি, অর্থনৈতিক বরাদ্দ সকল ক্ষেত্রে শুরু হল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ও অপরাপর জাতির প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা। জিন্নাহ ঘোষণা করলেন- একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। শুরু হল রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে বাঙালির সংগ্রাম (অবশ্য এ সংগ্রামে আদিবাসীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন, জেলও খেটেছিলেন)। এ সংগ্রামে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত শহীদ হলেন। ৬২ সালে পাকিস্তান সরকার একটি সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলো। এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি আবার সংগ্রাম করলেন। তারপর ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের পথে না গিয়ে সামরিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমাধান করতে চাইলেন। কোন দেশের কোন রাজনৈতিক সমস্যাকে সামরিক কায়দায় সমাধান করা যায় না। নিপীড়ন-নির্যাতন করে কোন জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না। তা একেবারেই অসম্ভব। ফলে যা হবার তাই হলো। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রাম জোরদার হতে লাগলো। ঊনসত্তরে এসে গণঅভ্যুত্থান হল। তারই পথ ধরে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে স্মরণে রেখে ১৯৭২ সালে দেশের সংবিধান রচিত হলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানে চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সন্নিবেশ করা হল। কিন্তু বাহাত্তরের সংবিধান আদিবাসীদের

গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করার কারণে এই সংবিধান সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক তেমনিভাবে মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু সংবিধানের বহু অনুচ্ছেদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিরোধী অনেক বিধান রাখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অবদানের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু আদিবাসীদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়নি। উপরন্তু এ সংবিধানে দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় পরিচিতি ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতিসহ মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি মেলেনি। সেদিক থেকেও বাহাত্তরের সংবিধান পুরোপুরিভাবে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক নয়। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাষ্ট্রের সংবিধানকে গণতান্ত্রিক হতে হবে। যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদেরকে গণতান্ত্রিক হতে হবে। নচেৎ দেশে কখনো সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা না গেলে বিপরীতে সাম্প্রদায়িক ও সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। সাম্প্রদায়িকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রে পরিণত হবে যে রাষ্ট্রে কোন না কোন রূপে সামরিক শাসন কার্যকর থাকবে, তখন সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। জঙ্গীবাদের আস্তানা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও ব্যর্থ রাষ্ট্রের পরিস্থিতি ইত্যাদি হবে তখন রাষ্ট্রের অনুষঙ্গ।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ অনুপ্রবেশের পেছনে অনেক রাজনৈতিক দলের কমবেশি ভূমিকা রয়েছে। বলাবাহুল্য হঠাৎ করে কোন কিছুর পরিবর্তন হয় না। কোন কিছুর পরিবর্তনে বেশ সময় নেয় এবং তা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই অংশ। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ার দ্বার অবারিত হলেও এর আগেও কিছু কিছু ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছিল যা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করা হয়েছিল। এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। যে ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং যিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন সেই অসাম্প্রদায়িক নেতা তাজউদ্দিন আহমদকে এক পর্যায়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রান্তিক অবস্থানে নিক্ষেপ করা হল। বিপরীতে সাম্প্রদায়িক ও ক্ষমতালোভী খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হল। এভাবে রাষ্ট্রে দিন দিন সাম্প্রদায়িক ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে রাষ্ট্রে তাদের শক্তি পাকাপোক্ত হলো। যার পরিণাম হল ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড। সাম্প্রদায়িক শক্তির মিশন সফল হল। বঙ্গবন্ধুর আশেপাশে যারা ছিল তারা বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিনের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করার জন্য এক শ্রেণী ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা। এই ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত হয়েছিল খন্দকার মোস্তাক ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা একপর্যায়ে সফল হয়। বঙ্গবন্ধু কৌশলগত কারণে তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণ করেন। তাজউদ্দিন সবসময় বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক শুভাকাংখী, বন্ধু ও অকৃপণ পরামর্শদাতা ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ আপদে বিপদে সর্বদা বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন বাকশাল গঠন করছিলেন তখন তিনি বাকশাল গঠন না করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন ইসলামী সম্মেলনে যোগদান ও ভূট্টোকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণের পরিকল্পনা করছিলেন তখনও তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাজউদ্দিন বলেছিলেন, ভূট্টো বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী স্থাপনের জন্য আসবেন না; বাংলাদেশে তাদের যারা মিত্র রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ পরিকল্পনা করে বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য আসবেন। তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশ দিন দিন বন্ধু ভারত ও রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে দুর্বল ও একাকী করার জন্য তাজউদ্দিন আহমদ থেকে দূরে সরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ অপসারিত হবার পর মোস্তাক আহমেদ বঙ্গবন্ধুর কাছের ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তাজউদ্দিন আহমদ আরো বলেছিলেন, 'ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র একটি অবাস্তব ধারণা। রাষ্ট্রে সব ধর্মের সমান অধিকার ও মর্যাদা থাকবে। একটি ধর্ম দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার পরিণতি হবে ভয়ংকর। ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদের উৎপত্তি হয়ে থাকে।' পাকিস্তানে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিণতি আমরা দেখেছি। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার পর এরশাদের কি অবস্থা হয়েছিল তা সবার জানা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটেও তাজউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ও শিক্ষনীয়।

আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বর্তমানে জামাত ও এরশাদের বহু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। জামাত দেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি রয়েছে। তাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে এদেশেঙ্গমানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে ইসলামি জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদ প্রতিষ্ঠা করা। সেইদিক দিয়ে জামাত বেশ কিছু ক্ষেত্রে সফল। আজ জামাতের কর্মসূচি আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি সব দলই কম বেশি বাস্তবায়ন করে চলেছে। কোন দল কৌশলগত কারণে বাস্তবায়ন করছে আবার কোন দল নীতিগত কারণে বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু সব দলের ক্ষেত্রে সত্য যে, সব দলই কম বেশি জামাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০১১ সালের ৩০ জুন তারিখে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনয়ন করে। এই সংশোধনীতে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ও 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' বিধানকে বলবৎ রাখে যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী এবং জামাতের কর্মসূচি। আওয়ামী লীগ বলার চেষ্টা করছে, বাস্তবতার কারণে তাদেরকে এসব বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশ করতে হয়েছে। কোন কোন নেতা বলার চেষ্টা করেছেন তারা কৌশলগত কারণে এসব বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশ করেছে। ভবিষ্যতই বলবে আওয়ামী লীগ নীতিগত কারণে না কৌশলগত কারণে এসব বিষয় সংবিধানে সংযোজন করেছে। কিন্তু বর্তমান বলছে আওয়ামী লীগ জামাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

ভবিষ্যতের প্রশ্নেও বলতে চায় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংস্কৃতি চর্চা করছে আগামীতে কি আওয়ামী লীগ এর নেতা-কর্মীরা এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? সংস্কৃতি পরিবর্তনের কাজ বড়ই কঠিন এবং তা কঠিন সংগ্রামের বিষয়। আওয়ামী নেতা-কর্মী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেই কঠিন সংগ্রাম কি পরিচালনা করতে পারবে? এসব প্রশ্ন আওয়ামী নেতা-কর্মীদের প্রতি রইলো। এখানে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রী তাজউদ্দিন যেমনি বাকশাল গঠন ও ভূট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন তেমনি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের পূর্বে মন্ত্রীসভার বৈঠকে পরিকল্পনা মন্ত্রী এ কে খন্দকার ও অর্থ মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিছবিল্লাহির রাহমানির রাহিমের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি; উপরন্তু এই দু'জনকে এ বক্তব্যের জন্যে তিনি ভৎসনা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব ১৯৭২ সালের নভেম্বরে বলেছিলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ ও সেক্যুলার বাঙালি জাতির অস্তিত্বের রক্ষাকারী হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আমি এই ধর্মনিরপেক্ষতার চারা বাংলাদেশের মাটিতে পুঁতে রেখে গেলাম। যদি কেউ এই চারা উৎপাটন করে, তাহলে বাঙালি জাতির স্বাধীন অস্তিত্বই সে বিপন্ন করবে' (দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা নভেম্বর ১৯৭২ খ্রী:)। পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ক্ষুন্ন হয়েছে। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা আজ আক্রান্ত। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার আজ ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর খরগহস্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ধর্মনিরপেক্ষতার চারা বাংলাদেশের মাটিতে রোপন করে গিয়েছিলেন সে চারা আজ তারই দল কর্তৃক আক্রান্ত।

এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী করে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানে সংযোজন করেছিল। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার মধ্য দিয়ে এরশাদ জামাতের কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করেছেন। এরশাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন। তখন স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এরশাদ ধর্মকে ট্রামকার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এরশাদ ভেবেছিলেন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হলে তিনি বেঁচে যাবেন। এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এজন্য তার প্রতি খুশি ও সদয় হবেন। জনগণ এরশাদের চালাকি বুঝতে পেরেছিলেন। সেকারণে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেও স্বৈরাচারী এরশাদ রেহাই পায়নি। নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন।

এরশাদের আগে ক্ষমতায় ছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনিও সামরিক উর্দি পরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন দলের মানুষকে নিয়ে জগাখিচুরী দল 'বিএনপি' গড়ে তুলেছিলেন। তিনি প্রথম সংবিধানে ধর্মীয় বিষয়কে সংযোজন করেছিলেন। তিনি সংবিধানে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' সন্নিবেশ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অনন্য ভূমিকা থাকলেও তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী বিধান সংবিধানে স্থাপন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া সংবিধানের মূল চারনীতি ক্ষুন্ন করেন।

ক্ষমতার নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে জামাতকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ই যুথবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছিলো। এক্ষেত্রে বিএনপি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে জামাতকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়েছিল। স্বাধীনতা বিরোধী জামাতের নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তাদের গাড়িতে বাড়িতে উড়িয়েছিল- জাতির জন্য এর চেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা আর কি হতে পারে!

এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত আদিবাসী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩৫ শতাংশ জমি আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা বেদখল করে রেখেছে। একটি অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলের নেতা-কর্মীরা ক্ষমতার জোরে বেআইনীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি বেদখল করে রাখবে তা কাম্য নয়। এটি আওয়ামীলীগ দলের নীতি আদর্শের পরিপন্থী। তথাপি বাস্তব যে, এসব জমি এখনো আওয়ামী নেতা-কর্মীদের বেদখলে রয়েছে। মহাজোট সরকার এসব জমি আইন প্রণয়ন করে স্ব স্ব মালিক বা উত্তরাধিকারীদের হাতে হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করলেও এখনো সে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এ বাস্তবতার পর্যালোচনায় আমরা কি বলতে পারি না আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে জিম্মি।

রামু ও রাঙ্গামাটির ঘটনায় সব দল কমবেশী সম্পৃক্ত

উপরের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের বড় বড় সব দল সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। আমরা রামু ও রাঙ্গামাটির ঘটনায়ও দেখেছি- এসব ঘটনায় দেশের বড় বড় সব দলের নেতা-কর্মী কম বেশি সম্পৃক্ত। এসব হামলায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দল মূল ভূমিকা পালন করলেও আওয়ামী-বিএনপির নেতা-কর্মীর সম্পৃক্ততাও লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। জামাত দেশে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে- এটিই স্বাভাবিক। এদেশের সমস্ত অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে কিংবা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার মধ্য দিয়ে জামাত এদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে- এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু আওয়ামী লীগ? যে দলটি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে সে দল বা সে দলের নেতা-কর্মী কিভাবে সাম্প্রদায়িক হামলায় অংশগ্রহণ করতে পারে? কিভাবে তারা আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জমি কেড়ে নিতে পারে?

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কোন শক্তির উস্কানী বা সহযোগিতা ছাড়া কোন সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হতে পারে না। বৃটিশ আমলে যেসব সাম্প্রদায়িক হামলা কিংবা দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল

বেশিরভাগ ঘটনার পেছনে বৃটিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। বৃটিশরা প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার 'ভাগ করে শাসন করা'র নীতি গ্রহণ করেছিলো। শাসকগোষ্ঠীর এ নীতির কারণে হিন্দু মুসলমানের মধ্যেকার বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো। এ বিভেদ নীতির কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিলো এবং ভারত উপমহাদেশে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম নিয়েছিলো।

রামু ও রাঙ্গামাটি- এই ঘটনা দু'টিতেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতার পর কোন কোন সময়ে আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভূমিকা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে।

সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে রাঙ্গামাটি ও রামুতে সাম্প্রদায়িক হামলা পরিচালনা করার সুযোগ খুঁজে আসছিল। জামাতের নেতারা চট্টগ্রাম থেকে রামুতে যেয়ে বহুবার মিটিং করেছে বলে জানা যায়। রাঙ্গামাটিতেও 'সমঅধিকার আন্দোলন' নামক ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠন পাহাড়িদের উপর হামলা করার সুযোগ খুঁজেছিল বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী রাজনীতি ও অন্যান্য সংকীর্ণ স্বার্থগত কারণে জাতীয় দলের কোন কোন নেতা-কর্মীও 'সমঅধিকার আন্দোলন' এর সাম্প্রদায়িক কর্মসূচির সাথে সবসময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলায় প্রশাসনের একটি অংশও সর্বদা উস্কানী ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িক ঘটনায় এ ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। রাঙ্গামাটি শহরে সংঘটিত এবারের সাম্প্রদায়িক হামলার বেলায়ও প্রশাসনের একটি অংশের নিষ্ক্রিয়তা ও সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা গেছে। এতে পরিষ্কার যে, প্রশাসনের অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি বেশ সক্রিয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম

মহাজোট সরকার কর্তৃক সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম পুনঃস্থাপনের কারণে দেশের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনে নিয়োজিত সাম্প্রদায়িক কর্মকর্তারাও সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে অংশগ্রহণে আরো সাহস পায়। রাঙ্গামাটি ও রামু- এই দু'টি ঘটনাতেও প্রশাসনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করে প্রশাসনে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী। কিন্তু রামু ও রাঙ্গামাটির ঘটনায় আইনশৃংখলা ও প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলারা জনগণের জানমাল রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেনি; উপরন্তু তারা নীরব ভূমিকা পালন করার মধ্য দিয়ে এবং পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ হামলাকারীদের প্রতিহত না করে সাম্প্রদায়িক হামলায় পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার কর্তৃক সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম পুন:স্থাপন একদিকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিকে সাহস ও মনোবল যুগিয়েছে, তেমনি এদেশকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে– যা আওয়ামী লীগ দলের জন্য আত্মঘাতির সামিল। আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে নানান সাম্প্রদায়িক কাজের কারণে আওয়ামী লীগকে একটি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষে আর কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশি বলে তাদের ধর্ম 'রাষ্ট্র ধর্ম' হবে আর অপরাপর জনগোষ্ঠীর ধর্ম 'অরাষ্ট্র ধর্ম' হবে গণতন্ত্রের রীতি তা বলে না। গণতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের জবরদস্তি নয়'। আমাদের দেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশি বলে তারা কোন জবরদস্তিমূলক আইন বা নীতি প্রণয়ন করতে পারেন না। বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ এবং এদেশ বহু ধর্ম ও বহু জাতির দেশ। একটি গণতান্ত্রিক দেশে কোন নাগরিকের ধর্ম রাষ্ট্রের আর কোন নাগরিকের ধর্ম অ-রাষ্ট্রের- এ ধরনের অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা থাকতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা ও সমান অধিকার থাকতে হবে।

উপসংহার:

একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। এই চেতনার আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। সেকারণে এই মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সকল ধর্ম ও জাতির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। স্বাধীনতার ৪১ বছরেও মুক্তিযুদ্ধের এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কেন বাস্তবায়িত হয়নি সে বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সকলকে সমস্যার গভীরে যেয়ে এ সমস্যার কারণ বের করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের অতীতের ভুলত্রুটি ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ পক্ষীয় দলের নেতা-কর্মীদের আত্মশুদ্ধি করে নিতে হবে। দলের ভেতর থেকে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা উপড়ে ফেলতে হবে। এর জন্য দরকার মতাদর্শগত সংগ্রাম। প্রয়োজন সারাদেশে সমাজের সকল স্তরে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। নিরন্তর সংগ্রামের পথে কেবল মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ উপড়ে ফেলা সম্ভব। এ কঠিন কাজকে আওয়ামী লীগ দলসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষীয় সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের সম্ভব করে তুলতে হবে। আর যদি এ কাজটি সম্ভব করে তোলা সম্ভব না হয়, তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমুন্নত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সত্যিকারের একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সকল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে একাট্টা হয়ে সমন্বিত সংগ্রাম পরিচালনা করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতিরাষ্ট্রে জাতিগত সমস্যা ও এর সমাধান : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

॥ মঙ্গল কুমার চাকমা ॥

পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রায় প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রে অন্যতম একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হলো জাতিগত সমস্যা। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'– এই তত্ত্বের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী বিশ্বে জাতিরাষ্ট্র গঠিত হলেও এমনটি দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোট হোক বড় হোক প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে একাধিক জাতির বা বহু জাতির বসবাস রয়েছে। আর জাতিরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দর্শন ও শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে মূল জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী এসব ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহের বিষয়ে প্রায় প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রে বরাবরই কোন না কোন সংকট তৈরি হয়ে থাকে। বিশেষ করে এসব ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসহ তাদের জাতিগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক জটিল রাজনৈতিক ও জাতিগত সমস্যা। তবে গণতান্ত্রিক ধারায় তুলনামূলকভাবে অগ্রসর কিছু কিছু রাষ্ট্রে এসব জাতিগত সমস্যাকে অত্যন্ত প্রশংসীয়ভাবে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে দেখা যায় এবং চূড়ান্তভাবে সমাধান না হলেও জাতিগত সমস্যাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে দেখা যায়।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দিকে যদি তাকাই, তাহলে এরূপ জাতিগত সমস্যা চোখে গড়ে। এর মধ্যে প্রতিবেশী মিয়ানমারে অন্যান্য সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হলো জাতিগত সমস্যা। মিয়ানমারে চিন, কারেন, কোচিন, মন, রাখাইন ইত্যাদি জাতিসমূহ এখনো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী নেপালের প্রায় ৫০টির মতো আদিবাসী জাতিসমূহের সমস্যার প্রতি বর্তমান অন্তর্বর্তী নেপাল সরকার বেশ গুরুত্বের সাথে নজর দিয়েছে যদিও এক্ষেত্রে নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোর এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের মাধ্যমে জাতিগত সমস্যার সমাধান এবং সংবিধানের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং লোকসভা, বিধান সভা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে এখনো জাতিগত সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান হয়েছে তা বলা যায় না। এখনো সেখানে জাতিগত সমস্যাকে একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমা বিশ্বের জাতিরাষ্ট্রের ভাবাদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। তারই আলোকে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে– 'ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।' কিন্তু বাঙালি জাতি ছাড়াও এদেশে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতি রয়েছে যারা বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্র গঠনের পূর্ব থেকে এদেশে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাঙালি জাতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং আত্মবলিদানে সামিল হয়েছে। কিন্তু এসব প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব ও অধিকারের সমস্যা সমাধান হয়নি। এখনো এসব জাতিসমূহের জাতিসত্তা, ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের স্বীকৃতি অর্জিত হয়নি এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় রয়েছে।

জাতিগত সমস্যার স্বরূপ

সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় পৃথিবীর সকল জাতির বিকাশ সমান নয়। নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে তাদের বিকাশের মাত্রা অসম। কোন কোন জাতি সমাজবিকাশের অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছে গেছে। আর অনেক জাতি এখনো বিকাশের নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। পশ্চিম ইউরোপের অনেক জাতি যেমন- ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ও অন্যান্য জাতিগুলো অনেক এগিয়ে গেছে। আবার পূর্ব ইউরোপের জাতিগুলো যেমন- চেক, ক্রোয়াট, আর্মেনীয় ইত্যাদি জাতিগুলো তুলনামূলকভাবে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। তার থেকে আরো বেশি পিছিয়ে রয়েছে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাতিন আমেরিকাসহ তৃতীয় বিশ্বের জাতিসমূহ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে আবার রয়েছে মূলধারার বৃহত্তর জাতিসমূহ ও প্রান্তিকধারায় আদিবাসী সংখ্যাল্প জাতিসমূহের মধ্যকার বিকাশের তারতম্য। তাই বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে বসবাসরত প্রান্তিকধারায় আদিবাসী জাতিসমূহের উপর জাতিগত শোষণ-নিপীড়নের মাত্রা সবচেয়ে প্রকট আকারে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে এসব রাষ্ট্রে জাতিগত সমস্যাও তুঙ্গে।

গণতন্ত্রের উপরই জাতিগত সমস্যার তারতম্য নির্ভর করে। যে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নেই বা কম সে দেশে জাতিগত

সমস্যা সবচেয়ে প্রকট ও নৃশংস। আর যে দেশে গণতন্ত্রের মাত্রা বেশি বা গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে সে দেশে জাতিগত সমস্যা কিছুটা কম বা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশ সবেমাত্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজে প্রবেশ করছে কিন্তু এখনো সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের ধারা বিদ্যমান রয়েছে সেসব দেশে জাতিগত সমস্যা প্রবল আকারে বিরাজ করছে। সামন্ততন্ত্র বরাবরই জাতি নিপীড়নের পক্ষে থাকে। প্রচলিত গণতন্ত্রের ধারায় যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আধা-সামন্ত ও আধা-পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠীর হাতে থাকে তারা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থে প্রবল অত্যাচারী হয়ে উঠে এবং পদানত জাতিসমূহের উপর নৃশংস শোষণ-নিপীড়ন চালায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জাতিগত সমস্যার রূপ অনেকটা এই ধারাতেই বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ অনেক প্রগতিশীল হলেও এবং অধিকতর মাত্রায় গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠীও জাতিগত নিপীড়নের পক্ষে থাকে। উপনিবেশিক কায়দায় তারাও সাধারণ জনগণ ও প্রান্তিক আদিবাসী জাতিগুলোকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখে এবং তাদের উপর শোষণ-নিপীড়ন চালায়। এই শোষণ-নিপীড়নের সাথে যুক্ত হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী (পেটি-বুর্জোয়ারা) ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ। এমনকি মেহনতি শ্রেণীর উপরতলায় একটি সংখ্যালঘু অংশও তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। যারা সবাই লুণ্ঠনের ফল উপভোগ করে। সুতরাং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির একটি সামগ্রিক ধারায় জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত থাকে যার নেতৃত্বে থাকে ধনিক শ্রেণী। পুঁজিবাদী সমাজে প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার মধ্যেই জাতিগত সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে দেখা যায়। তাই পুঁজিবাদী সমাজে প্রজাতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থায় যে মাত্রায় গণতন্ত্র সুসংহত রূপ লাভ করে সেই মাত্রায় রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসহ সকল জাতির সমমর্যাদা ও সমঅধিকার লাভ করে থাকে। তাই গণতন্ত্র বিকাশের উপরই নির্ভর করে জাতি সমস্যা সমাধানের মাত্রা।

> গণতন্ত্রের উপরই জাতিগত সমস্যার তারতম্য নির্ভর করে। যে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নেই বা কম সে দেশে জাতিগত সমস্যা সবচেয়ে প্রকট ও নৃশংস। আর যে দেশে গণতন্ত্রের মাত্রা বেশি বা গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে সে দেশে জাতিগত সমস্যা কিছুটা কম বা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে এই শাসকশ্রেণীর মধ্যে রয়েছে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া, আমলা পুঁজিপতি ও সাম্প্রদায়িকতার ধারক-বাহক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি অংশ। বাংলাদেশ সামন্তবাদী সামাজিক স্তর অতিক্রম করে সবে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী সামাজিক স্তরে পদার্পন করছে। তবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনো সামন্তবাদী চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। সামন্তবাদী চিন্তাধারার অগণতান্ত্রিকতা, আত্মমুখীনতা, পরনির্ভরশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, শ্রমবিমুখতা, প্রগতিবিরোধী মানসিকতা ইত্যাদি এদেশের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে চরমভাবে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সবে গড়ে উঠা পুঁজিপতিদের মধ্যে কিছু পুঁজি গঠিত হলেও তা মূলতঃ মুৎসুদ্দী পুঁজি ও আমলা পুঁজির সমষ্টি। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো কালো টাকা সাদা করার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। স্বভাবতই বাংলাদেশে এখনো সেভাবে জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশ লাভ ঘটেনি। জাতীয় পুঁজিও সেভাবে মজবুত অবস্থানে গড়ে উঠতে পারেনি। মুৎসুদ্দী পুঁজি ও আমলা পুঁজিই হচ্ছে দেশীয় পুঁজিপতিদের একমাত্র মূলধন। এককথায় বলা যায় যে, বাংলাদেশের পুঁজিপতিরা হচ্ছে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া; যাদের মূল ভিত্তিই হলো সাম্রাজ্যবাদের দালালীপনা ও তাদের কিছু উচ্ছিষ্ট লাভ করা। শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের মধ্যে জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। প্রয়োজনে দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদের দালালীপনা করে থাকে। তাই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে তাদের নতজানু নীতি আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এদেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে মূলত: সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারগিরি লাভের প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী উচ্ছিষ্টের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে প্রবল সংকট তৈরি হয় এবং এদেশের জনগণ এক অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে বাধ্য হয়।

যে কোন জাতিরাষ্ট্রে মুৎসুদ্দী চরিত্রের শাসকগোষ্ঠী যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে স্বাভাবিকভাবে সে দেশে গণতন্ত্র তত বিকাশ লাভ করতে পারে না। গণতন্ত্র থাকে অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থায়। তাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রও এখনো হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোনোর পর্যায়ে রয়েছে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সামন্ত চিন্তাধারা পরিব্যাপ্ত থাকায় অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। এদেশের শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে এদেশের মূল জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষকে যেমন শোষণ-নিপীড়ন করে, তেমনি ততধিক পরিমাণে এদেশের প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহকে নানা বঞ্চনা, নিপীড়ন, শোষণ ও বৈষম্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে থাকে। এদেশে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আদিবাসী জাতিসমূহের উপর জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দলন-পীড়ন চালানোর যে প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে অগণতান্ত্রিকতার প্রত্যক্ষ ফসল। ফলতঃ এদেশে জাতিগত সমস্যা এক প্রকট অবস্থায় বিরাজ করছে এবং প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব এক বিপন্ন ও সংকটজনক অবস্থায় বিরাজ করছে।

দেশের বিদ্যমান জাতিগত সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে দুটো দিক রয়েছে; একটি হচ্ছে দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর

অন্যদিকে হচ্ছে প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম। জাতীয় আন্দোলনের এই দুটো ধারার মধ্যে একটা থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। বরঞ্চ একটা আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটি এগিয়ে যেতে পারে না। জাতীয় আন্দোলনের এই দুটো ধারাকে সমানতালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এগিয়ে চললেও জাতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবস্থা তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। এদেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তি অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে।

জাতিগত সমস্যার উত্তরণ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পুঁজিবাদী সমাজের জাতিরাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার মধ্যেই জাতিগত সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে দেখা যায়। তারই আলোকে এদেশে আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতির দাবি উঠেছে বা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। অপরদিকে সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আসন সংরক্ষণ করা, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারের দাবি উঠে এসেছে।

> বাংলাদেশের পুঁজিপতিরা হচ্ছে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া; যাদের মূল ভিত্তিই হলো সাম্রাজ্যবাদের দালালীপনা ও তাদের কিছু উচ্ছিষ্ট লাভ করা। শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের মধ্যে জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য স্থির করার অধিকার প্রত্যেক জাতির আছে। নিজের মনের মতো করে নিজের জীবন রচনা অধিকার প্রত্যেক জাতির রয়েছে। সেই অধিকার অন্য জাতির অধিকার পদদলিত করে নয়। স্বশাসনের ধারায় জাতীয় জীবন রচনা করার অধিকার প্রত্যেক জাতির আছে। তাই জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক চুক্তিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে 'প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ যে গঠনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তা মূলতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মূল চেতনাকে ভিত্তি করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতি-সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অঞ্চলগত (রিওজিনাল) স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জাতি-সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেসব জাতিসমূহের অঞ্চল-ভিত্তিক একক কেন্দ্রীভূত (concentration) সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেসব জাতিসমূহের বেলায় কি হবে? এক্ষেত্রে অনেকে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। তবে সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্ক রয়েছে।

(ক) অঞ্চলগত (রিওজিনাল) স্বশাসন ব্যবস্থা

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়। এই অধিকার ন্যূনতম স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার অধিকার পর্যন্ত অধিক্ষেত্রকে বুঝায়। কিন্তু পুঁজিবাদী জাতিরাষ্ট্রে 'স্বাধীন হওয়ার অধিকার'কে স্বীকার করা হয় না। জাতিরাষ্ট্রের জাতি-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে বড়জোর ভূখণ্ডগত স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসনকে স্বীকার করে নেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের যে বিধান করা হয়েছে তা অঞ্চলগত স্বশাসন ব্যবস্থার একটি ব্যবস্থা হিসেবে বলা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থায় এসব পরিষদকে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, জেলা পুলিশ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, রক্ষিত নয় এমন বন ও পরিবেশ, যুব উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, আইন প্রণয়নে বিশেষ প্রাধিকারসহ মোট ৩৩টি বিষয় হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার বিধান করা হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আত্মপরিচয়ের অধিকার যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়নি।

বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা এখনো কার্যকরভাবে প্রবর্তিত হতে পারেনি। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে চুক্তি মোতাবেক ক্ষমতায়নের পরিবর্তে অথর্ব অবস্থায় রাখা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে পরিণত করা হয়েছে দুর্নীতির আখড়ায়। সেটেলার বাঙালি কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমি স্ব স্ব জুম্ম মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে প্রণীত হয়। এখনো সেই বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম

অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধানটি লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। অব্যাহতভাবে সমতল অঞ্চল থেকে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকছে ও বসতি গড়ে তুলছে। তারা পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের জায়গা-জমি জবরদখল করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু পাহাড়িদের পুনর্বাসনের বিধান এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কোটি কোটি টাকা ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণীত হয়নি এবং চুক্তির পর আজ অবধি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু 'অপারেশন উত্তরণ' নামক একপ্রকার সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি।

মহাজোট সরকার গত ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ আপামর পার্বত্যবাসী ও দেশের গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক নাগরিক সমাজের দাবি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোর আইনী হেফাজত প্রদানের লক্ষ্যে সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। বলাবাহুল্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই তাদের পক্ষে সাংবিধানিক গ্যারান্টি বা স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। তবে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা তা প্রদান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীকালে তার ধারেকাছেই যায়নি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে ও সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান না করার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো অঞ্চলগত স্বশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি; যে কারণে এ অঞ্চলে জাতিগত সমস্যা একটি প্রকট আকার ধারণ করে রয়েছে।

(খ) সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসন

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অপরাপর সমতল জেলাগুলোতে প্রায় ৪০টির অধিক প্রান্তিক আদিবাসী জাতি রয়েছে যারা বিভিন্ন জেলাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছে। জনসংখ্যার দিকে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনসংখ্যা থেকে তারা অনেক বেশি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মতো তাদের অঞ্চল-ভিত্তিক একক কেন্দ্রীভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বললেই চলে। এ ধরনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংখ্যাল্প জাতিসমূহের জন্য অঞ্চল-ভিত্তিক স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে এ ধরনের জাতিসমূহের সমস্যা সমাধানের জন্য সংস্কৃতিগত জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এখানে সংস্কৃতি বললেই কেবল ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিকেই বুঝলে হবে না। সংস্কৃতি একটি ব্যাপক শব্দ। সংস্কৃতি হলো মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ড– অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, সমষ্টিগত, পারিবারিক, ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড আবাসন, খাদ্যাভাস, মননশীলতা ইত্যাদি। এ সকল কর্মকান্ডের মধ্যেই একটি জাতির সংস্কৃতি নিহিত থাকে। এককথায় বলা যায়, গোটা জীবনপ্রণালীই হলো সংস্কৃতি। সুতরাং সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে কেবল ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, গান-বাজনা সংরক্ষণের স্বাধীনতাকেই বুঝলে ভুল হবে। সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, সমষ্টিগত, পারিবারিক, ব্যক্তিগত অধিকারের স্বাধীনতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

বিশ্বের দেশে দেশে প্রান্তিক আদিবাসী জাতির সংস্কৃতির অধিকার তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সর্বোপরি তাদের ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আদিবাসী জাতিসমূহের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সুরক্ষা প্রয়োজন। তাদের ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ যদি না থাকে, তারা যদি তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে, তারা ভূমিহীন জাতিতে পরিণত হয়, তাহলে তাদের সংস্কৃতির অস্তিত্বই থাকবে না। একটা জাতির তার স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব ও পরিচয়ের মূল ভিত্তি হলো সংস্কৃতি। তার সংস্কৃতি যদি নাই থাকে এবং সংস্কৃতির মৌলভিত্তি 'উৎপাদনপ্রণালী' বা উৎপাদন ব্যবস্থা' যদি তারা হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নই আসে না। আর এখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ হচ্ছে নিজের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকার। তারা তাদের উন্নয়নের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য অগ্রাধিকার তালিকা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অধিকার, নিজেদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করার অধিকারের স্বাধীনতাকে বুঝতে হবে।

তাই প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনকে দেখতে হবে তাদের প্রথাগত ভূমি অধিকার, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার, তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত পূর্বক সম্মতি ব্যতীত ছিনিয়ে নেয়া ভূমি, ভূখণ্ড ও সম্পদের পুনরুদ্ধার ও ফেরত পাওয়ার অধিকার, তাদের মাতৃভাষার অধিকার, রাষ্ট্র ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠার অধিকার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রথা চর্চা ও পুনরুজ্জীবিতকরণের অধিকার, উন্নয়নের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য অগ্রাধিকার তালিকা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অধিকার, নিজেদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করার অধিকার। উপরোক্ত সংস্কৃতিগত স্বায়ত্তশাসনের আলোকে এদেশে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য নিম্নলিখিত দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে–

(১) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৫৪টির অধিক আদিবাসী

□□□ জাতিসমূহের জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

(২) □আদিবাসী জাতিসমূহের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারসহ ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

(৩) □বেহাত হওয়া আদিবাসীদের জায়গা-জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করা।

(৪) □দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদে আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।

(৫) □আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন করা এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক কমিশন গঠন করা।

(৬) □আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসী জাতিসমূহের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার গ্যারান্টি প্রদান করা।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে একদিকে আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে জাতিগত পরিচিতির স্বীকৃতি লাভের প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের সহজাত অধিকারকে খর্ব করে সংবিধানে আদিবাসীদের 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' হিসেবে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিচয়ে আখ্যায়িত করা হয়েছে; অন্যদিকে আদিবাসী ও বৃহত্তর মূলজনগোষ্ঠী নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচিতি প্রদান করার মাধ্যমে ভিন্ন ভাষাভাষি ও ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসী জাতিসমূহকেও 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সর্বোপরি ৪০ বছর পর (১৯৭২ সালের পর) ২০১০ সালে সংবিধান সংশোধনের সময়েও সংবিধানে আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারগুলো সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জাতি ছাড়াও আদিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতিসমূহ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আদিবাসী জাতিসমূহকে সংবিধানে 'বাঙালি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী, কিন্তু জাতি হিসেবে বাঙালি নয়। তারা জাতি হিসেবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসি, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহাতো, হাজং প্রভৃতি এক একটি স্বতন্ত্র জাতি।

দেশের দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্য সরকারের কোনো উন্নয়ন নীতিমালা নেই। আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, তা অনেকটা উপর থেকে আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী কোনো ভূমিকা নেই। তাই এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়ন তো দূরের কথা, এতে আদিবাসী জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের সংস্কৃতি, জাতিগত অস্তিত্ব এবং ভূমি ও সম্পদের উপর তাদের মালিকানা স্বত্বকে বিপন্ন করে তোলে চরমভাবে। কাপ্তাই বাঁধ, ফুলবাড়ী কয়লা খনি, মধুপুরে বনায়ন, ইকো-পার্ক ও জাতীয় উদ্যান ঘোষণা ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিশেষ কার্যাদি বিভাগ কর্তৃক দেশের সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও সমতল আদিবাসীদের কোন সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা নেই। এই থোক বরাদ্দের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নেই, ফলে এই বরাদ্দ আদিবাসীদের মধ্যে নতুন সমস্যা তৈরি করছে, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী ঐক্য ও সংহতিকে ব্যাহত করছে। এভাবে দেশের সমতল অঞ্চলেও জাতি-সমস্যা এক উদ্বেগজনক অবস্থায় বিরাজ করছে।

দেশের বিদ্যমান জাতি-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এদেশের শাসকগোষ্ঠীকে অবশ্যই উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার মধ্যেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। তার পাশাপাশি আদিবাসী জনগণসহ দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানতালে এগিয়ে নিতে হবে। বলা বাহুল্য মহান নেতা এম এন লারমা এদেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতিগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অপহরণ

॥ স্নেহ কুমার চাকমা ॥

তখন রাত ১০টা টেরর ও জেক নামে কুকুর দুটি বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে ঘেউ ঘেউ করছে। আমার স্ত্রী ও পালিতা কন্যা মৃত্তিকা চতুর্দিকে তল্লাশি করেও কোন কিছু দেখতে পেল না। হঠাৎ কিছুক্ষণ পর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কেউ ভাবতে পারি নাই।

২৪ ডিসেম্বর ২০০৬ রাত্রি ১০:৩০ কারা যেন আমার বাড়িটি ঘেরাও করে দরজা খুলে দিতে নির্দেশ দিল। এদিন আমার ভগ্নি অমরিণী কয়েকদিন থাকবে বলে দুপুরে এসেছিল। আমাদের ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মা কিছুদিন হলো অসুখে ভুগছেন। ছেলে শ্রীমান যশ স্কুল বন্ধ হওয়ায় ১ সপ্তাহ হলো ঢাকা থেকে বাড়িতে এসেছে। সে আদিবাসী গ্রীণহার্ট স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর ১৩ ঢাকা এর দশম শ্রেণীর ছাত্র।

আমি সারাদিন সুপারি বাগানে কাজ করেছিলাম। তাই ক্লান্তিজনিত শরীরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুম ঘুম অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছি। অন্যরা গল্প গুজবে রয়েছে। দরজা খুলে দিলাম না। তাদের পরিচয় জানতে চাইলাম। ইউপিডিএফ-এর লোক বলে পরিচয় দিল এবং বললো আমার সঙ্গে আলাপ রয়েছে। এ মুহূর্তে তাদের সঙ্গে আলাপ করার অপারগতা জানিয়ে পরের দিন আলাপ করার অনুরোধ করি এবং আমাকে তারা যেখানে যাওয়ার কথা বলবে সেখানে যাবো বলে কথা দিলাম। দরজা খুলে দিব না নিশ্চিত হয়ে তারা পাশের একটি বাড়ি থেকে দা এনে ঠিক আমি যে জায়গাটিতে খাটে ঘুমাতাম সেই জায়গাটিতে বেড়া কাটতে শুরু করলো।

> রাষ্ট্র ইসলামিক মূল্যবোধে আদর্শিক হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। হাজার হাজার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু আদিবাসীরা যাযাবরের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

আমার বাড়ি হাফ ওয়াল। ডবল বেড়া, জানালাগুলি লোহার গ্রিল ও কাঠ, দরজা দেড় ইঞ্চি কাঠের এবং সিটকারী ছাড়াও ভিতর থেকে লৌহার এ্যাঙ্গেল দিয়ে আঁটা। কাজেই বাইরে থেকে জোরে হলেও দরজা খোলা দুঃসাধ্য। তারা দরজা ভেঙ্গে ঢুকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। বেড়া কেটে বাড়িতে ঢুকে এবং সাথে সাথে মোটা নাইলনের দড়ি দিয়ে আমাকে ঊনষাট বছর বয়সের অধিক বয়স্ক লোককে হাতে কোমড়ে বেঁধে ফেলে। মা তাদেরকে বললেন পুত, আমার ছেলেকে মেরে ফেলিও না। আমাকে বাড়ি থেকে বের করলো এবং গেইট অতিক্রম করার সাথে সাথে আমার কোমড়ের দড়ি যার হাতে ধরা রয়েছে সে বললো জিদু (জেঠা), তুমি নাকি বাদি চান পিতা-কান্দারা চাকমা, সাং- দোখাইয়া, রূপাকারী মৌজা-এর নিকট যে জমি বিক্রি করেছ সে জমির পারের অংশ বড় শিমুল গাছটি পর্যন্ত দাবি কর? এজন্য তোমার এ দশা হয়েছে। আমি বললাম– জিদু এর উত্তরতো এ অবস্থায় দেওয়া যায় না। যদি তুমি এর সত্যটি শুনতে চাও বা কেউ শুনতে চায় আমি নিজেকে সুভাগ্যবান মনে করবো।

রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাঁটছি তো হাঁটছি থামাবার কোন ফুরসৎ নেই। শীতকাল। কন্‌কনে শীত। তবুও ঘর্মাক্ত শরীর। আমার গেঞ্জির উপর সোয়েটার, তার উপর জ্যাকেট। পরনে পাজামার উপর লুঙ্গি। পায়ে কোন সেন্ডেল বা জুতা নেই। মানসিক উৎকণ্ঠা। দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পর একটি ছড়ায় নামলাম। ছড়ার উজানেও অনেক্ষণ হাঁটলাম। তারপর পাহাড় বেয়ে হাঁটতে হবে। গ্রুপ কম্যান্ডারের পায়ে ফোস্‌কা পড়েছে। জুতা ব্যবহার করতে পারছে না। তার জুতা জোড়াটি আমার পায়ে ফিট্ হওয়াতে আমার পায়ে লাথি মেরে তা দিয়ে দিল। তবু ভাল। অন্ততঃ পা-দুটো যেন কষ্ট না পায়। খুব ভোরে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। ২টি মোন ঘর রয়েছে। ১টি খালি অন্যটিতে পরিবার রয়েছে। তারা আমাকে দেখে কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়েছে মনে হলো। আমি বরাবর সবাইকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। জায়গাগুলি আমার নিকট সুপরিচিত।

এখানে ভাত পাকানোর ব্যবস্থা করলো। ১ টি মোরগ কাটলো। এটি নাকি আমার শেষ বিদায়ের খাওয়া। তাই মাংস খাওয়ায়ে বিদায় দেবে। আমি প্রকৃতির ডাকের কথা বললে ছাড়তে দিল। তারপর একই বাঁধা অবস্থায় আলাদা স্থানে আমাকে নিয়ে রাখলো। লক্ষ্য করলাম গ্রুপ কম্যান্ডার কিছু দূরে গিয়ে ওয়াকি-টকি দিয়ে কারোর সঙ্গে আলাপ করছে। এরা ১৩ জনের মধ্যে ১২ জন সশস্ত্র। এখান থেকে উত্তরে টিনের ছাউনির অনেক ঘর দেখা যায়। মনে হলো এটি মাচলং এরিয়া।

ভাত খাওয়ার পূর্বে ফের আমাকে তাদের কাছে নিয়ে আসে এবং কেন আমি শান্তিবাহিনীতে গিয়েছি প্রশ্ন করে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় গ্রুপ কম্যান্ডার ১ টি মোটা লাঠি নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে আমার পিঠে আঘাত করে বললো- জ্ঞান দিচ্ছ। পরিধানের কাপড়-চোপড়ই আমাকে রক্ষা করলো। না হলে এখানে ঢলে পড়ে মৃত্যু হতো। পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিতে এ আঘাতের চিকিৎসা দীর্ঘ দিন করতে হয়েছিল। ভর দুপুরে হাঁটার সময় আমাকে প্রশ্ন করে– যখন আমি সশস্ত্র অবস্থায় ছিলাম এ রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করেছি কিনা। অসংখ্যবার আসা যাওয়া করেছি- উত্তর দিই। কিন্তু তখন এরকম রৌদ্রজ্জ্বল ন্যাড়া পাহাড়ে হাঁটতে হতো না। ঐসময় দিগন্ত বিস্তৃত গভীর বন ছিল এবং কদাচিৎ সূর্যের আলো মাটি স্পর্শ করতো। গাছ-বাঁশ ও লতা-গুল্মের ছায়ায় হাঁটতাম। ফলের মৌসুম অনুযায়ী বনের নানা প্রকারের ফল খুঁজে নিয়ে খেতাম। গভীর বনে সারা বছর কোন না কোন খাদ্য থাকে। নানা প্রকার পাখির কল-কাকলী, নানা প্রকার বানরের ডাকে, বনের অজানা অদেখা সরীসৃপ, কীট পতঙ্গের শব্দে গভীর বনকে আরো রহস্যময়ী বলে মনে হতো। কোন কোন সময় ছড়াতে- ঝিরিতে মাছ-কাঁকড়া ধরতাম, বন্য শুকর শিকার করতাম। এখন আর এসব দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি জুম আর রাণ্যা। জীবন মরণ সন্ধিক্ষণেও বলে উঠলাম জিদু, কিছুই রক্ষা করতে পারলাম না। এ সম্পদ রক্ষা করার জন্য জীবনে সবকিছু ত্যাগ করেছি। এখন নিজেকেও রক্ষা করতে পারলাম না।

১টি পরিত্যক্ত জুম ঘরে পৌঁছলাম। এখানে বাঁশের চোঙাতে পানি পেলাম। পরিকল্পিতভাবে তা রাখা হয়েছে মনে হলো। সকলে তৃষ্ণার্ত। পানি পান করলাম। কিছুক্ষণ জিরানো হলো। আমার কোমড়ের দড়ি যার হাতে ধরা থাকে সে চুপি চুপি বললো জিদু, তুমি মরবে না তুমি বাঁচবে। তোমাকে ভাল করে ব্যারাকে নেওয়ার জন্য অর্ডার এসেছে। পথিমধ্যে ১ টি লাঠি নিতে হলো। লাঠিতে ভর করে চললাম। ক্ষুধায় অস্থির। সকালে মাত্র ২ গ্রাস ভাত খেতে পেরেছি। গ্রুপ কম্যান্ডারের অর্ডার আসামি পালানোর চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।

সন্ধ্যা হয়েছে। সাজেকের রাস্তাটি পার হলাম। পরক্ষণে আর্মির কয়েকটি গাড়ি চলে গেল। আমরা একটি জুমঘরে থেমে পানি পান করে আবার হাঁটতে লাগলাম। এখানে কয়েকজন রয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর একটি বড় ছড়ায় পৌঁছে ছড়ার পাড়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর ওরা কাসাবা সিদ্ধ নিয়ে পৌঁছল। ছড়ার পাড়ে এগুলি খেয়ে নিলাম, পানি পান করলাম। আবার পাহাড় বেয়ে হাঁটতে শুরু হলো এবং অবশেষে আরো একটি ছড়ায় নামলাম। ছড়ার উজানে হাঁটতে হাঁটতে ছড়ার পাড়ে একটি ঘর পেলাম এটি হচ্ছে তাদের পাকঘর ও ডাইনিং হল। ভাত তরকারী পাকানো রয়েছে। খাওয়া দাওয়া করে পাহাড় বেয়ে উঠলাম। পাহাড়ের চূড়ায় এদের আস্তানা। তখন সময় আনুমানিক ৯টা। তারা আমার অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের কয়েকটি কথার উত্তর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার একটি পা আরো এক জনের পায়ের সাথে শিকলের বেড়ি দিয়ে তালা মারলো।

সকাল হলে দেখতে পাই অনুপম, শচীন ও তপনকে। আমার পা তপনের পায়ের সাথে তালা মারা ছিল। ছয়মাস হলো তাদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। আমার মত তাদেরও অপরাধ তারা প্রাক্তন শান্তিবাহিনী সদস্য, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ রয়েছে। আমাদের পাহারার জন্য সবসময় সেন্ট্রি রয়েছে। এ অবস্থায়ও তারা আমাকে পেয়ে অনেক সাহস পেয়েছে জানিয়ে দিল। আমি অভয় দিলাম। সন্ত্রাসীরা ২০/২২ জন হবে। সকলে আমাকে জিদু সম্বোধন করে এবং সমীহও করে। অনেকেই আমাকে ভাল করে চিনে আবার কেউ কেউ আমার নামটি মাত্র শুনেছে বলে জানায়।

২৫ ডিসেম্বর ভাত খাওয়ার পূর্বে স্নান করবো বলে আমাকে ডাইনিং হলে (রান্না ঘরও বটে) নিয়ে যাওয়া হল। গরম পানি করে দিল। স্নানের সাবান দিল। স্নান ছেড়ে ভাত খেয়ে আস্তানায় উঠে আসলাম। আমাদের জন্য সশস্ত্র পাহাড়া সব সময় থাকে। দুটি আস্তানা। একটিতে আমার সাথে শচীনকে রাখে। দিনে সকলকে খোলা রাখে। রাত্রে পায়ে শিকল পরিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। বিকালে যে ছেলেটি আমার পায়ে শিকল পরিয়ে দেয় সে আমার পা ধরে প্রণাম করে বলে জিদু, আমায় ক্ষমা করে দিও আমাকে নির্দেশ পালন করতে হয়। রাত্রিতে যে ছেলেটি আমার পাছে ঘুমাতো একদিন সে বললো জিদু, তুমি বাদি চান-এর ষড়যন্ত্রের শিকার। তোমাকে মেরে ফেলার জন্য কোন কোন সময় স্কুর্টারে করে বাগেই হাটে এসে আমাদের লোকের সংগে আলাপ করে যায়। টাকা দিয়ে যায়। সে গাছের ব্যবসা করে। তার গাছের চালির কোন ক্ষতি যাতে নাহয় সেরকম আমাদের মধ্যে অর্ডার রয়েছে। গাছের ট্যাক্সের টাকা তার একজন বিশ্বস্ত লোক মারফত পাঠিয়ে দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছেলেটি আমাকে ভাল করে চিনে, ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। না হলে এসব কথা বলতো না। সব ছেলেরা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে। ২৭ ডিসেম্বর আমার সাথে সুগত চাকমা দেখা করলো। পিঠের আঘাতের জন্য মালিশ বা ঔষধের কথা বললাম। ছেলে শ্রীমান যশ-এর লেখাপড়ার কথা শুনিয়ে একটি চিঠি লেখার কথা বললাম এবং চিঠিটি আমার স্ত্রীকে পৌঁছিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম। সে রাজি হলো। তারপর আমার কথামত সাদা কাগজ ও কলমের ব্যবস্থাও করে দিল। চিঠিটি লেখলাম–

ভন্তে, আপনার মত যোগ্য করে গড়ে তুলতে শ্রীমান যশকে আপনার নিকট প্রত্যাশা রেখে আপনার হাতে তুলে দিলাম।

আমাকে কোন ঔষধ বা মালিশ দেওয়া হয় নাই। ৪ জানুয়ারি অপরাহ্ন আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো বলে জানিয়ে দিল। এর দুদিন পূর্বে শচীনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া করে স্বয়ং কম্যান্ডারসহ রওয়ানা হবো এমন সময় একে একে (কম্যান্ডার বাদে) আমাকে প্রণাম করে বললো জিদু, আমাকে মাপ করে দিও। তাদেরকে বললাম– তোমরা সকলে নিরপরাধ। চলার পথে দেখলাম তপনও সংগে রয়েছে। তাকেও মুক্তি দিয়েছে। অনুপমকে পরে মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানলাম। আসার সময় আমার লুঙ্গিটি তাকে দিয়ে আসলাম। রাত্রিটি পাহাড়ের উপর কাটানো হলো। খুব ভোরে কাচলং-এর পূর্ব কূল থেকে পশ্চিম কূলে পার হলাম। ৮/৯ টার সময় কলা পাতার প্যাকেট লাঞ্চ করলাম। তারপর পাহাড়ে উঠলাম। দীর্ঘক্ষণ চলার পর আবারো নীচে একটি

শুকনা বড় ছড়ায় পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর কয়েকটি মাচাং ঘর দেখতে পেলাম। দুটি মাচাং ঘরে ভাগ করে উঠলাম। জায়গাটি কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। পরে মানসপটে সব পরিস্কার হয়ে উঠে। তখন দুপুর বেলা।

এ এরিয়ায় তিন রাত্রি কাটিয়ে দিলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাকে দেখে লোকেরা কম্যান্ডারের নিকট প্রতিবাদ করলো– কেন আমাকে অপহরণ করা হয়েছে? আমার কি অপরাধ জানতে চাইল। তারা আমার অপহরণের কথা শুনে অনেক দুঃখ পেয়েছিল, আফসোস করেছিল বলে জানায়। কিন্তু এভাবে যে চাক্ষুষ দেখবে ভাবতেও পারিনি। তারা আমার সংগে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনুমতি পেলো না। আমাকে তারা শান্তিবাহিনীর একজন ভাল সদস্য হিসেবে জানে। আমি তাদের মাঝে আটারকছড়া, কড়ল্যাছড়ি, ডাক্তারখানা মুড়, ভাঙ্গামুড়, রাঙ্গাপানিছড়ায় (লংগদু উপজেলায়) তিনবছর কাটিয়েছি। ঐ সময় তাদেরকে অধিকারের কথা, সংগঠনের কথা বলেছিলাম। তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে সহযোগিতা করেছিলাম। তাই তারা আমাকে ভাল করে চিনে, জানে। এসব এলাকার জনগণের উপর আর্মিদের ক্ষ্যাপা হওয়ার কারণ ১১ জুন ১৯৭৭ সনে কড়ল্যাছড়িতে শান্তিবাহিনীর নিকট আর্মিরা শোচনীয়ভাবে পর্যদস্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে আর্মিরা লংগদু'র টেলারসহ দিল্লীর বাদ্‌শাহ্‌ তুঘলকএর দাক্ষিণাত্য অভিযানের ন্যায় জুম্মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা, গুম, জ্বালাও-পোড়াও, নারী ধর্ষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিতাড়িত করে তদ্‌স্থলে সেটলার মুসলমানদের বেদখল করতে দিল। জনগণ সর্বহারা হয়ে শুধু জীবন নিয়ে কাচলংএ আশ্রয় নেয়। কাচলংএ কয়েক বছর কাটিয়ে সাজেক চলে আসে। সাজেকেও আমি তাদেরকে পাই। পার্বত্য চুক্তি হওয়ার পর আশা করছিল তাদের ভিটে-মাটিতে ফিরে আসতে পারবে, জায়গা-জমি ফিরে পাবে। আবার নতুন করে বাড়ি করবে, বাগান করবে ইত্যাদি। কিন্তু যেতে পারলো কই? এখন এই মেলাছড়াতে বসবাস করছে। ঘুরতে ঘুরতে অকালে চিকিৎসা না পেয়ে কত আপনজন, প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলেছে। আর সন্তানের লেখাপড়া? তা তো কবে উবে গেছে। সেটা এখন কল্পনা মাত্র।

রাষ্ট্র ইসলামিক মূল্যবোধে আদর্শিক হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। হাজার হাজার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু আদিবাসীরা যাযাবরের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন এদের। উল্টো ভূমি বেদখলকারী সেটলাররা সরকারি রেশনপত্র, সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে আসছে। প্রশাসন তাদেরকে জামাই আদরে রেখেছে। ফলে এ পর্যন্ত আদিবাসী জুম্মদের উপর সেটলাররা যে অগণিত অপরাধ সংঘটিত করে চলেছে তার কোন বিচার হয় নাই, কোন অপরাধীকে ধরা হয় নাই। তাই সেটলাররা হিংস্র-বর্বোরচিত ঘটনা ঘটাতে উৎসাহিত হয়। উপরন্তু তখন থেকেই বরাবর সাবেক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান এবং বর্তমান প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার তাদের হয়ে কথা বলেন।

বাংলাদেশে অনেক মানবতাবাদী সংগঠন, রাজনৈতিক ও সমাজিক সংগঠন একটি ইভ টিজিং ঘটনাকে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে অবলোকন করে দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এর বিরুদ্ধে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন করে যেভাবে সোচ্চার হয়, সেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উপর যে অন্যায়-অত্যাচার, মা-বোনের উপর বলাৎকার, অবিচারের শাসন জগদ্দল পাথরের ন্যায় বাংলাদেশ সরকার চাপিয়ে দিয়ে স্বভূমে প্রবাসী করে ধ্বংসের প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে এর বিরুদ্ধে কোন মানবাধিকার কমিশন, কোন মানবতাবাদী সংগঠন, কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন, বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবি কেউ অন্ততঃ মানবতার মূল্যবোধকে রক্ষার জন্য সেভাবে সোচ্চার হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না।

সকালে গ্রুপ কম্যান্ডারের ইচ্ছাতে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করলাম। তার প্রশ্ন আমার দেওয়া উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মত প্রকাশ করলেন এবং বললেন আপনাদের মত বিপ্লবীকে মেরে ফেলা জাতির নিকট অপরাধ করা। আমাদের এক হতে হবে বললাম। খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে করলাম। একজন গাইড বিশ্বজিৎ ও উত্তরায়ণকে নিয়ে হাজির। বিশ্বজিৎ চাকমা রূপাকারী মৌজার হেডম্যান ও রূপাকারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। উত্তরায়ণ চাকমা বঙ্গলতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। উভয়ে আমি ভাল আছি কিনা জানতে চাইল এবং আমাকে নিতে এসেছে বললো। তারপর কম্যান্ডারের সাথে কিছু আলাপ করে রওয়ানা দিলাম। যোগাযোগের বিঘ্ন ঘটায় ২ দিন বেশি থাকতে হয়েছে। সুভাগ্য যে আমাদের চলার পথে ১ জন লোক পাওয়া গেল এবং লোকটির বাড়ির পাশদিয়ে আমাদের নাকি যেতে হবে। লোকটি ১ টি করাট, ১টি মুরগী, ১টি ইক্ষু বহন করছে। আমারও ১টি ভর দেওয়া লাঠি রয়েছে। আমাদের যাত্রা পথে মেলাছড়ায় অনেকে বাড়ি থেকে চেয়ে রয়েছে।

দীর্ঘ পথ হাঁটতে হলো। গোধূলী লগ্নে লোকটির বাড়িতে পৌঁছলাম। তার স্ত্রীকে দিয়ে গরম পানির ব্যবস্থা করলো। কনকনে শীত। উঠানে আগুনের ব্যবস্থা হলো। সকলে গরম পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুইয়ে আগুন পোহাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতরে যাওয়ার ডাক দিল। আমাদের জন্য পরিপাটি করে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক আমাকে লক্ষ্য করে বললো, জিদু আপনার কথা বাবার নিকট শুনেছি। আপনার অপহরণের সংবাদ শুনে বাবা দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং বাবার মত এখানে সকলে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। আপনাকে সকলে মানুষ হিসেবে চিনে। আমি তার বাবার কথা জানতে চাইলাম। তারপর বাড়ির মালিক আমার নিকট মাফ চেয়ে নিয়ে ১ টি বোতলে কিছু মদ ও ৩ টি গ্লাস সামনে রেখে বললো– জিদু, কত যে ভাল লাগতেছে, আনন্দ লাগতেছে, কত খুশি হয়েছি তা বলে বুঝাতে পারবো না এ খুশী ও আনন্দের মুহূর্তে যেটি হওয়ার নয় সেটা হোক বলে মদ পান করতে অনুরোধ করলো। চেয়ারম্যানরা আমার কনিষ্ঠজন। তারা ইতস্ততঃ বোধ করলেও এই আনন্দঘন আবেগে আমি কিছু মুখে দিয়ে তারা পান করলো। বাড়ির মালিক পান করলো না। জীবনে এটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল। যে মুরগিটি পোষার জন্য কিনে এনেছিল সেটিও কেটেছে।

আরামে ঘুমালাম। খুব ভোরে গৃহকর্ত্রী ভাত পাকিয়ে দিয়েছে। ভাত খেয়ে বিদায় নিলাম। ১০ টা নাগাদ বাগেইহাট পৌঁছলাম। পশ্চিম কূল থেকে পূর্ব কূলে পার হয়ে একটি বাড়িতে চা-নাস্তা করে ১ টি কান্ট্রিবোট রিজার্ভ করলাম। ২টা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছলাম। আমার আসার সংবাদ পেয়ে অনেক লোক বাড়িতে অপেক্ষায় রয়েছেন। সন্ধ্যা না হওয়া অবধি অনেক পুরুষ-মহিলা দেখা করে গেলেন। শ্রদ্ধেয় তিলকানন্দ মহাথেরো বিস্কুট, পানীয় নিয়ে আশীর্বাদ করতে আসলেন। উপজেলা সদর থেকে সুদর্শন আসলো। তার মাধ্যমে টিএনও মোশারফ সাহেব এবং থানার ওসি সাহেব সংবাদ পাঠিয়েছেন তারা আগামীকাল সকালে আমার সাথে দেখা করতে আসবেন। সুদর্শনকে দিয়ে তাদেরকে সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম আমি আসবো সেখানে দেখা হবে। অতঃপর সুদর্শন তার বাড়িতে দেখা করার স্থান ঠিক করলো এবং আমার দুপুরের খাওয়া তার বাড়িতে হবে জানায়। সুদর্শনকে বললাম আগামীকাল সকালে ৮টায় আমি পার্টি অফিসে আসবো কর্মীরা যেন উপস্থিত থাকে।

স্ত্রীর নিকট থেকে জানি যে, সে কোন চিঠির খরব জানে না। তার নিকট থেকে আরো শুনলাম আমাদের মাদি কুকুরটি (টেরর) আমার অপহরণের পর থেকে আমাকে যেদিকে নিয়েছে কুন্ডলি পাকিয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে দৌড়িয়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে আবার একই স্থানে কুন্ডলি পাকিয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে কুঁ কুঁ শব্দ করে। এভাবে অনাহারে ৫ দিন কাটিয়ে মারা যায়। কি অপূর্ব প্রভুভক্তি ও মমতা। ইতর প্রাণীর এ মহৎগুণ মানুষের কাছে বিচ্ছুরিত থাকলে মানুষকে অমানুষ বলা হতো না।

স্ত্রী থেকে আরো জানলাম অপহরণের পরের দিন খুব সকালে পার্টির থানা শাখা কার্যালয়ে সংবাদটি দেওয়ার পর রাতারাতি বাঘাইছড়ি উপজেলায় অপহরণের কথা প্রচার হয়ে যায় এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থানা শাখা উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাচলং কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী, চাকরীজীবী, মুরুব্বীদের সমন্বয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে বিরাট মিছিল বের করে অপহরণের প্রতিবাদ ও মুক্তি দাবি করলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও প্রতিবাদ মিছিলের সমর্থন দিলেন। পার্টি সভাপতির বলিষ্ঠ ভূমিকা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম কুমার চাকমা এর সুচিন্তিত পরামর্শ মুক্তির জন্যও বিরাট অবদান রাখে। কলেজের পক্ষ থেকে প্রভাষক, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান ও মেম্বার, চাকরীজীবি পক্ষ থেকে চাকুরে, মুরুব্বী পক্ষ থেকে একটি বড় প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতাদের সকাশে উপস্থিত হয়ে আমার মুক্তির দাবি তুললেন। অবশেষে তাদের ঐকান্তিক ভালবাসার স্নিগ্ধতার আশীর্বাদে আমি মুক্তি লাভ করি। তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কর্মময় জীবনে অর্জিত এমহৎ সম্পদ আমার বরাবর হিসেবে রয়েছে। ৮ জানুয়ারি উপজেলায় যাওয়ার পথে বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ অনেক হিতাকাঙ্ক্ষীর সাথে রাস্তার মধ্যে দেখা হলো। তারা আমার সাথে দেখা করতে আমার বাড়িতে আসছেন বলে জানান। রাস্তাতে আমার কুশলাদি তাদেরকে জানালাম।

থানা শাখা অফিসের পাশে ২টি দোকানে পার্টি সদস্যরা আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। আমি পৌঁছার পর অফিসে বসলাম। তাদের উৎসুক প্রশ্নের উত্তর- ঘরের বেড়া কাটার সময় আমার প্রতিক্রিয়া, আমাকে কিভাবে নিয়ে গেল, তাদের ব্যবহার, কি কি বলছে, দিনগুলি কিভাবে কেটেছে, তাদের কোন নেতার সাথে দেখা হয়েছে কিনা, তাদেরকে চিনেছি কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তবে বাদিচান সম্পর্কে জমি বিক্রি কথাটি নয়। তারাও আমাকে অপহরণের পর কি কি ভূমিকা রেখেছে বর্ণনা করলেন। বাদিচানের উপস্থিতি নাই দেখে প্রশ্ন করলাম– বাদিচান আছে নাই? কেউ বললেন– সে তো ছিল, কেউ বললেন– বাদিচানকে বাজারের দিকে যেতে দেখেছি, একজন বললেন– প্রতিবাদ মিছিলে সে দায়িত্ব পালন করে নাই। উল্লেখ্য, বাদিচান টাকা কালেকশনের দায়িত্ব পাওয়ার পর সুদর্শন চাকমার বাড়ির পাশে ১টি বাড়ি কিনে বাড়িটি তখন থেকে ভাড়া দিয়ে আসতেছে। এই বাড়িতে প্রত্যেকদিন রাত্রিযাপন করে সকালে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ির পাশে খেয়া ঘাটের দোকানে বসে প্রদর্শী হয়ে কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করে এবং বিকালে উপজেলায় চলে যায়।

আলাপ আলোচনা শেষ করে সুদর্শনের বাড়িতে যাই। অনেকেই আমার সাথী হলেন। কিছুক্ষণ পর টিএনও এবং থানার ওসি সাহেব আসলেন। তাদের সাথে আমার অপহরণের বিষয়, এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা, প্রশাসনের সহযোগিতা ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার পর তারা বিদায় নিলেন। খাওয়া-দাওয়া হলো। তারপরেও আরো অনেকের সাথে দেখা হলো কথাবার্তা হলো।

৫ টায় জ্ঞানজীব, মানোভা রঞ্জন, বড়ঋষি'র বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বারি বিন্দু ঘাটের বাজারে পৌঁছে বাদিচানকে দেখতে পেলাম। আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে তার মোটর সাইকেলে সে উপজেলার দিকে চলে যায়। কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করাকালীন সময়ে মোটর সাইকেলটি কিনেছে। এরই মধ্যে ত্রিশংকু চাকমা (বড়াদম, রূপকারী মৌজা) থেকে ২ কানি ধান্য জমি খরিদ করে। পার্টিকে দোহাই দিয়ে গাছের ব্যবসা করাসহ অন্যকে দিয়েও গাছের ব্যবসা করে। হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে (বনরূপা, রাঙ্গামাটি সদর) ১০ বছর মেয়াদি স্বামী-স্ত্রীর বড় একাউন্ট রয়েছে এবং বাৎসরিক ৩২,০০০ (বত্রিশ হাজার) টাকা কিস্তি প্রদান করে বলে প্রকাশ। পার্বত্য চট্টগ্রাম লাক্সারী লঞ্চ মালিক সমিতিতে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকে একাউন্ট আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উত্তর কালিন্দিপুরে (রাঙ্গামাটি সদর) জায়গা খরিদ করে ৪ তলার বিল্ডিং ফাউন্ডেশন নিয়ে ১ তলা বাড়ি করাসহ ইত্যাদি দুর্নীতির অভিযোগ কর্মী মহলে এবং জনগণের অনেকের মুখে মুখে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তার খুড়োতুত ভাই মেম্বার পদপ্রার্থী প্রগতি চাকমাকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য একই ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী বিনিময় চাকমার সমর্থনকারী কান্তি চাকমা (৪৪) ও এ্যালেন চাকমা (২৫) কে সন্ত্রাসী স্টাইলে রাত্রে দলবল নিয়ে নিজেই মারপিট করে হুমকি দিয়ে আসে যেন বিনিময় চাকমার পক্ষে ভোটের প্রচারণা না চালায়। তারপর পার্টির কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযোগ আসলে আমি, শান্তিপ্রিয় চাকমা (উদ্যম), সুদর্শন চাকমা আরো কয়েকজন পার্টি কর্মীসহ স্থানীয় মুরুব্বীদের সমন্বয়ে বড়াদম হাই স্কুলে বিচারের পদক্ষেপ নিই। বিচারে বাদিচান দোষী

সাব্যস্ত হয় এবং তাকে মাফ চাইতে হয়, আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করতে হয়। ইহার পর যদুনাথ দেওয়ান, গুণেন্দু বিকাশ চাকমা ও কিশোর কুমার চাকমার নেতৃত্বে নতুন থানা কমিটি গঠনের সময় কর্মীদের আলোচনার সিদ্ধান্তক্রমে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং থানা পর্যায়ের পদমর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। আমি এলাকার প্রবীণ সদস্য হওয়ার কারণে সামগ্রিক দায়িত্ব দেখার ভার আমার উপরও বর্তায় বিধায় বাদিচানের ক্ষোভ আমার উপর। ইহার পর বাদিচান সমভাবাপন্ন কতিপয় স্থানীয় চাকরীজীবীসহ দোখাইয়া, ধনপাতা ও মাইচছড়ি সমাজের একমাত্র শ্মশানখোলাটিতে স্বঘোষিত সাধক যিনি অদৃশ্য হয়ে গর্তে সাধনা করে মোক্ষম জ্ঞানের অধিকারী দাবি করেন, যার হাতের স্পর্শে পানি পবিত্র হয়ে সর্বরোগের ঔষধ হয়ে যায়, যার সাধনা শক্তিতে স্বর্গ থেকে দেবগণ সাহায্য করতে আসে তার ছোট ভাই ধর্মতিষ্য ভন্তের (স্বর্গপুরি ভন্তে নামেও পরিচয়) জন্য 'কাচলং সুদৃষ্টি ধর্মশালা' নাম দিয়ে ১টি বিল্ডিং করে। শ্মশানখোলায় যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আইনতঃ গুরুতর অপরাধ ও দণ্ডণীয়। আইনের এই বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সৃষ্ট কাচলং সুদৃষ্টি ধর্মশালা তিন সমাজকে মৃত দেহের সৎকার কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিরাট দুর্ভোগ পোহাতে দিচ্ছে। সমাজের কেউ ভয়ে কিছু বলতে সাহস করে না বা শ্মশানখোলা অবমুক্তির জন্য আইনের আশ্রয় নিতে ভয় পায়।

পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়াশীল বাদিচানরাই বাঘেইছড়ি উপজেলায় ইউপিডিএফকে ডেকে নিয়ে আসে। ইউপিডিএফ-এর ন্যায় তারাও এখন পার্টির সমালোচনা মুখর এবং সংস্কার নাম দিয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি জুম্ম জাতির অধিকারের সনদ-এর কথা তাদের মুখে আর আসে না, ব্যক্তি বিশেষের উপর সমালোচনা করা এবং চাঁদা সংগ্রহ করা তাদের মুখ্য বিষয়। চাঁদা না দিলে অস্ত্রের হুমকি, চাঁদার যন্ত্রনায় জনসাধারণ এখন হাঁপিয়ে উঠেছে। ইউপিডিএফ এখন গর্বিত। যেহেতু সুদর্শনকে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে পুরস্কৃত করেছে, সংস্কারেরা তাদের আশ্রিত। একদিন যারা ইউপিডিএফ-কে চুক্তি বিরোধী, দালাল, জাতীয় বেঈমান, জাতীয় কুলাঙ্গার, সন্ত্রাসী বলতো তারা আজ তাদের কৃপাতে ধন্য ধন্য।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সন জনসংহতি সমিতির সদস্য হওয়ায় আওয়ামী রাজনীতির রোষানলে পড়ে জমাধন কার্বারীর হত্যা কেসে জড়িত করে ডেপুটি কমিশনার জিন্নাত আলী আমাকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করেন। এক বছর বন্দী জীবন থাকাকালীন বাবা কেস চালিয়ে নিতে বাড়ির অস্থাবর সম্পত্তি শেষ করে স্থাবর সম্পত্তি ০.৮৬ শতক জমি বাদিচানের ঠাকুরদাদা গুনলাল (হরখিয়া) চাকমা (দোখাইয়া) এর নিকট ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকায় বিক্রি করেন। জমিটি পুরা ইক্ষু চাষে ভর্তি ছিল। জীবিত কালীন পরিস্থিতির কারণে বাবা জমি রেকর্ড করে দিয়ে যেতে পারেন নাই। তবে ভোগ দখল করতে দিয়ে গেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে জমি-জমা আমার নামে রেকর্ড করে দেব। তখন হরখিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি এবং তার ছেলেরা কোন কালে বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে আমি জমি তাদের নামে রেকর্ড করে দিব। অনেকেই বলতেন ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকায় ০.৮৬ শতক জমি ঐ সময়ও পাওয়া যায় না। তখন দায়েপড়ে ইক্ষু চাষে পরিপূর্ণ জমিটি জুম্ম জাতীয় রাজনীতি করার কারণে বিক্রি করতে হয়েছিল ব্যক্তিগত খরচের জন্য নয় বলে অনেকেই বলতেন। আরো এভাবে বলতেন যে ১৯৭৩ সন হতে ২০০৬ সন পর্যন্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলের দাম, জমি ক্রয়ের দামের চেয়ে বেশি হয়েছে। অধিকন্তু জমি ক্রয়ের টাকা হরখিয়ার টাকা নয়। এই টাকা সফর মুল্লুক সওদাগর (রাঙ্গামাটি) ও বাদশা মিয়া কন্ট্রাক্টরের (বটতলী) টাকা। তারা ২ জনে মিঠা (গুড়) ব্যবসায়ের জন্য হরখিয়াকে প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা দিয়ে থাকেন। এক সময় হরখিয়া কিছু মিঠা সাপ্লাই দিয়ে আর দিল না। বকেয়া টাকাও ফেরত দিল না। পরে এর সত্যটা আমি বাদশা মিয়ার ছেলে আব্দুল সবুর ও আব্দুল গফুর থেকে জেনে নিই। আব্দুল সবুর নিজে গিয়ে হরখিয়া থেকে অনেক বার মিঠা নিয়ে এসেছেন এবং অনেক হাজার টাকা পাওনা রয়েছে বলেও জানান। সফর মুল্লুক সওদাগরের ভাগিনা আব্দুল হাকিম (বর্তমান মারিশ্যা বাজার চৌধুরী, ৩৮১নং বটতলী মৌজা) মামার হয়ে হরখিয়ার সাথে মিঠা ব্যবসায়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনিও বলেছেন হরখিয়ার কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা তাদের পাওনা রয়েছে। তাই ন্যায়তঃ হরখিয়া জমি পায় না বলে আমাকে অনেকে যুক্তি দিয়েছেন। একান্ত যদি আমি জমি দিতে চাই তাহলে জমির দাম বর্তমান দামের চেয়ে কিছু কম দাম ধরে আরো টাকা আদায় করতে পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাদের সকলকে বলেছি- বাবার আত্মার সৎগতি চাই, শান্তি চাই। বাবার কথার কোন হেরফের হবে না। বাবা আমার জন্য তার জমি বিক্রি করেছেন।

জীবিতকালীন হরখিয়া থেকে জেনে নিয়েছি কার নামে জমি রেকর্ড করে দেব। তার কথামতে মেজ ছেলে স্নেহ কুমার (ভদা নাগা) চাকমা ও ছোট ছেলে সুনীল কান্তি (বড়পেদা) চাকমাকে তার দেওয়া ভাগের শতাংশ অনুযায়ী জুলাই, ২০০৬ সনে নিজস্ব উদ্যোগে রেকর্ড করে দিলাম। এ সময় বাদিচানের করা হাফওয়াল বাড়ি, রাইস মিল, টিউবওয়েলও রেকর্ড করে দেওয়া তার কাকা বড়পেদার অংশের জমিতে পড়েছে। জমি রেকর্ড করে দেওয়া কালীন বড়পেদা অনুপস্থিত ছিল। তাসত্বেও জেলা প্রশাসনের অফিসে রেভিনিউ অফিসারকে অনুরোধ করে রেকর্ড করে দিলাম। তখন বড়পেদার জামাই রিপন চাকমা (সার্ভেয়ার, এসি ল্যান্ড) মৌজার হেডম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা ও রিপন-এর জেঠা শ্বশুর ভদা নাগা আমার সততায় অভিভুত হয়েছিল। রিপনতো বললো, জেঠা বাবুর মত সৎব্যক্তি যেমন দেখি নাই ভবিষ্যতেও দেখবো বিশ্বাস হয় না। এক সময় বাদিচান আমাকে বলেছিল জমিটি তার পাওয়ার অনেক আশা ছিল। জমি রেকর্ড করে দেওয়ার পূর্বে ভদানাগা ও তার স্ত্রী, বড়পেদা ও তার স্ত্রী আমাকে প্রস্তাব দেয় যে, জমিটির পরের খাস দাগের নং ২০৯২ খতিয়ান নং ১ লামচড়টি আমি বন্দোবস্তী দিলে তাদের কিছু বলার নেই এবং না দাবি পত্রও দিয়ে দিবে। তারা ১৬/১১/২০০৫ সনে না দাবি পত্র দিয়ে দিল। তারপর হেডম্যানের সুপারিশ নিয়ে বন্দোবস্তীর দরখাস্ত দিলাম। জমিটি চাষের জন্য সাফ করতে লেবার গেলে তারা বাধা দিল। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। পরিশেষে বিচারের আশ্রয় নিতে

বাধ্য হই। হেডম্যান কার্যালয়ে হেডম্যান, চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় সমাজের মুরুব্বী ও পার্টির বিশিষ্ট কর্মীসহ সমাধানের জন্য কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সিদ্ধান্ত মেনে নেয় বটে জমিতে কাজ করতে গেলে বাধা প্রদান করে। এভাবে কয়েকবার সিদ্ধান্ত অমান্য করার পর বিচারকেরা আবারও সর্বশেষ ২৮/০৮/২০০৬ সন সিদ্ধান্ত (রায়) কার্যকরী করার ঘোষণা দিলে বড়পেদার স্ত্রী বললো, আমাদের বড় ছেলে বাদিচানের কথাতো আমাদের শুনতে হবে। ছেলে হলেও সেতো আমাদের মুরুব্বী। তার কথার বাইরে আমরা কিছু করতে পারি না। পরে তাদের কার্বারী হরেন্দ্র লাল কার্বারী তো ঘোষণা দিল দরকার হলে দা, খন্তা নিয়ে মাঠ রক্তাক্ত করা হবে। অথচ না দাবিপত্রে সেও সাক্ষী হয়ে দস্তখত করেছে। বাদিচানের এক জেঠা তরনী মোহন (তক্ক্যা) চাকমার বাড়ির পাশে আমার যে ধান্য জমি রয়েছে বাদিচানের প্রতাপে তরনী মোহন সেই জমিও দখল করে চাষাবাদ করছে। সেও না দাবিপত্রে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছে। ইহাছাড়া না দাবিপত্রে মৌজা হেডম্যান বিশ্বজিৎ চাকমাসহ বুদ্ধ কিংকর চাকমা ও প্রগতি চাকমা (মেম্বার) স্বাক্ষী হয়ে এবং নাদাবিপত্রের লেখক পূর্ণ লাল চাকমা স্বাক্ষর করেন। ঐ সময় রিপন তার শ্বশুরের বাড়িতে এসে আমার জমি রেকর্ড করে দেওয়ার সততার কথা স্মরণ করে দিয়ে তার শ্বশুরকে এভাবে অনুরোধ করেছিল- জেঠাবাবুকে জমিটি দখলে দিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি না করতে। এ কথার প্রেক্ষিতে রিপনকে বাদিচান সতর্ক করে দিয়ে উদ্ধত কণ্ঠে বলেছিল, নাক গলাতে এসো না রিপন। বাদিচানের এ কথাটি রিপন হেডম্যান বিশ্বজিৎকেও জানিয়েছিল।

সুতরাং বাদিচানের মত প্রতিক্রিয়াশীলেরা পার্টিতে ঘাপটি মেরে বসে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং ক্ষমতা পেলে নিজের স্বার্থ আদায় করতে মরিয়া হয়ে উঠে। যখন তারা পার্টি বিরোধী কার্যকলাপে, দুর্নীতিতে ধরা পড়ে ঐ সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির (কর্মীর) উপর তাদের ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। নিজের ভুলের সংশোধনের চেষ্টা না করে আদর্শ বিবর্জিত হয়ে মনুষ্যত্বের লোপ পেয়ে রোষানলে পড়া ঐ ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। অতএব, বাদিচানের মত বিপথগামীরা ইউপিডিএফ-এর মত সন্ত্রাসীদের সাথে আঁতাত তো করবে এবং নানা কথা বাড়িয়ে বানিয়ে বলবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইউপিডিএফ আমাকে অপহরণ করেছে কিন্তু বাদিচানরাই ইউপিডিএফ-কে দিয়ে মেরে ফেলার জন্য অপহরণ করেছে, যেহেতু আমি আদিবাসী জুম্ম জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনসংহতি সমিতির সদস্য।

পরিশেষে বলা যায়– অপহরণ নামক গল্পটি কাল্পনিক নয়। সত্য ঘটনা নিয়ে এটি লেখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে বিগত ১৪ বছর ধরে এ ধরনের সত্য ঘটনা নিয়ে অসংখ্য গল্প লেখা যায়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ যারা এদেশের অগণতান্ত্রিক, জাত্যাভিমানী, মৌলবাদী ও জাতিবিদ্বেষী শক্তির সাথে আঁতাত করে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে মরণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা এভাবে হত্যা, জখম, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন করে চলেছে। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যাতে আর সংঘটিত হতে না পারে তজ্জন্য চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসের অবসান ঘটাতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনতিবিলম্বে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

এম এন লারমা

॥ শেকড় ত্রিপুরা ॥

তুমি জন্ম নিয়েছিলে চেঙ্গী নদীর পাড়ে মাওরুম গ্রামে
কি সুন্দর গ্রাম ছিলো
ছিল স্রোতস্বীনি মাওরুম, পাখির কলতান
সবুজ পাহাড়, প্রকৃতির লীলাভূমি
সে এক অপরূপা রূপবতী রূপসী কন্যা
যেন কোন শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা এক অপরূপ ছবি।।

এক সময় কাপ্তাই লেকের পানি এসে
ডুবিয়ে দিল অপরূপ মাওরুম গ্রাম
ডুবে গেল মাঠ, মাঠ ভরা ফসল, সাজানো ফুলের বাগান
আর কত কি!।।

তুমি যখন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে
নিয়েছিলে শুধু এক মুঠো মাটি–
কি তোমার প্রতিজ্ঞা ছিলো জানি না
কি যন্ত্রনা আর বেদনাই না পেয়েছিলে তুমি
তা ঠিক অনুমান করা যায় না;

দেশের রাজা আর সামন্তপ্রভু সবাই
শাসকের চাবুকের ভয়ে মেনেছিল হার
হার মাননি তুমি
একাই দাঁড়ালে– দ্রোহে
থমকে গেল শাসক কিছুক্ষণের জন্য হলেও
'কুর্নিশ লহ তুমি হে বীর
তোমায় লাল সালাম'।।

হে বিপ্লবী তোমায় লাল সালাম
তুমি জাগানিয়া গান গেয়ে জাগিয়েছিলে ঘুমন্ত জুম্ম জাতিরে
তুমি শিক্ষার আলোয় জ্বালিয়ে দিলে,
তুমি জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে,
সংগ্রাম শেখালে, বিপ্লব শেখালে জুম্ম জাতিকে
তাই সংগ্রাম, বিপ্লব আজ জুম্ম জাতির ধমনীতে বহিছে বহমান।।

তুমি বিপ্লবী, তুমি সংগ্রামী
তুমি ঋষি, তুমি যুধিষ্ঠির
তুমি প্রিয় নেতা জুম্ম জনগণের, মেহনতি মানুষের
কৃষক, শ্রমিক কামার কুমার- সকলের সকলের।।

তুমি আজ নেই
তবুও তুমি সবার হৃদয়ে– আজো বর্তমান
তোমার আদর্শ বহমান ধমনী ধমনীতে
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে
এ যে মৃত্যুহীন, মৃত্যুঞ্জয়
সবার হৃদয়ে তুমি আজো বহমান।।

যে পথ দেখিয়ে গেছে আমাদের প্রিয় নেতা- এম এন লারমা
সে পথ দিয়ে চলছি আমরা, চলবো অনন্তকাল
সুকান্তের ভাষায় বলবো– তারপর হব ইতিহাস।।

কৃষ্ণ কিশোর চাকমার স্মরণে*

তোমার জীবনের অনেক বছর পরে,
হে মহান! তোমার স্মৃতিকথা আজো মনে পড়ে।
ভক্তিতে হৃদয় ভরি নোয়ায়ে আমার শির,
তোমার উদ্দেশ্যে জানাই সালাম হে কর্মবীর।
তুমি এসেছিলে আমাদের পার্বত্য দেশে অন্ধকার রাতে,
শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে জুম্ম জনপদে।
তুমি ডেকেছিলে উদাত্ত কণ্ঠে করি আহ্বান,
শিক্ষা মন্ত্রে মিলবে জনতার মুক্তির সন্ধান।
তুমি জ্বেলেছিলে দীপ, জ্বলেছিলো আলো দিগন্তে দিগন্তে,
গ্রাম জুমিয়ার আকাশে বাতাসে সীমান্তে সীমান্তে।
মুক্ত জীবনের পাখিরা গেয়েছিল তব জয়গান,
তোমার নামে জানিয়েছে তারা সহস্র সালাম।
সেদিন এদেশে সামন্ত সমাজে অত্যাচারী বর্বর,
তুমি তার বিরুদ্ধে মুক্ত মানুষের প্রথম কণ্ঠস্বর।
রুখে উঠেছিলে, করেছিলে প্রতিবাদ,
অবসান করিতে এদেশের সামন্তবাদ।
তুমি এনেছিলে শিক্ষা, দিয়েছিলে জনতার মুখে হাসি,
ভাল বেসেছিলে এদেশের ফুল-ফল, নদ-নদী জলমাটি।
আজি তাই এদেশের আকাশে-বাতাসে সকলিময়,
তুমি আছো, তুমি রবে হে মহান, আলোকে আলোকময়।

**কৃষ্ণ কিশোর চাকমা পার্বত্য জনপদের জুম্ম সমাজে প্রথম বিপ্লবী শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ যিনি ঘুঁনেধরা সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে একাধারে জুম্ম সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অন্যধারে জুম্ম সমাজে জাতীয় চেতনা উন্মেষের বীজ বপন করেছিলেন। জন্ম: ১৪ জুলাই ১৮৯৫ ও মৃত্যু: ২ জানুয়ারি ১৯৩৫।*

২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ সংঘটিত রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলা

এ হামলা পূর্ব-পরিকল্পিত ও সেটেলার বাঙালিসহ রাষ্ট্রযন্ত্রে লুকিয়ে থাকা কায়েমী স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক মহল এ হামলার সাথে জড়িত

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালিরা রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় জুম্মদের উপর এক বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। এ হামলায় ১ জন সরকারি চিকিৎসক, ১৪ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও ১ জন সংবাদদাতাসহ শতাধিক জুম্ম, ৩ জন কলেজ শিক্ষক, ৯ বাঙালি সেটেলার ও ছাত্র আহত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগারসহ জুম্মদের বহু ঘববাড়ি ও দোকানপাত ভাঙচুর করা হয়। হামলা শুরু হওয়ার অনেক দেরীতে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। এমনকি মোতায়েনের পরও পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং ফলশ্রুতিতে পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর টহলরত অবস্থায় সকাল ১০:৩০টা থেকে আনুমানিক বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত একনাগারে রাঙ্গামাটি শহরের প্রধান সড়ক বরাবর সেটেলার বাঙালিরা বিভিন্ন এলাকায় জুম্মদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। শুধু তাই নয়, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখও ১৪৪ ধারা জারী অবস্থায় হাসপাতাল এলাকায় এক পথচারী নিরীহ জুম্মকে হামলা করা হয় এবং সন্ধ্যা নামার পরপরই পূর্ব ট্রাইবেল আদাম ও রাজমনি পাড়ায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালানোর চেষ্টা করা হয়।

সেদিন ২২ সেপ্টেম্বর ২১০, ২০৯ ও ২০৬ নং শ্রেণীকক্ষে যথাক্রমে একদল বাঙালি ছাত্র কর্তৃক শ্রেণীকক্ষে পাঠগ্রহণরত জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার মধ্য দিয়ে গোটা রাঙ্গামাটি শহরে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালি কর্তৃক একতরফা হামলার ঘটনার সূত্রপাত হয়। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে মারামারি শুরু হওয়ার পর পরই জুম্মদের হামলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে সেটেলার বাঙালিরা কলেজ গেইট, বনরূপা, কাঠালতলী, ভেদভেদী, উত্তর কালিন্দীপুর, আমানত বাগ, রিজার্ভ বাজার, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, তবলছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় জড়ো হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ঘটনা শুরুর পর অনেক দেরিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মোতায়েনের পর কলেজ এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের ছত্রভঙ্গ করলেও তারা অন্যান্য এলাকায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের পরই রাঙ্গামাটি শহরের প্রধান সড়ক বরাবরই প্রকাশ্য দিবালোকে বেশির ভাগ অফিস, দোকান ও গাড়িতে হামলা হয়েছে। বস্তুতঃ এ হামলা হলো সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর একতরফা হামলা। যেমন বনরূপায় ওয়ান ব্যাংক, শেভরন ও ডক্টরস ল্যাব, পার্বত্য চট্টগ্রাম

আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগার, বিজনসরণীর একটি এনজিও অফিস ও হাসপাতাল, তৎলগ্ন দোকানপাত, বিভিন্ন এলাকায় গাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে সেটেলার বাঙালিদের একতরফা হামলা। এসব অফিস ও দোকানপাতের বিল্ডিং-এর মালিক হচ্ছে জুম্মরা; তাই সেগুলোকে টার্গেট করেই হামলা সংঘটিত করা হয়। এটা ক্ষোভের বশে স্রেফ হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা নয়, এটা সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা নিয়ে জুম্মদের মালিকানাধীন বিল্ডিং ও ঘরবাড়িতে হামলা করা হয়েছে। আর রাঙ্গামাটি উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে সম্মেলনরত জুম্ম চেয়ারম্যানদের হামলা, বনরূপায় ডা: সুশোভন দেওয়ানসহ জুম্মদের উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়া, ডিসি অফিসের সামনে জুম্ম সাংবাদিক হিমেল চাকমার উপর হামলা ছিল সম্পূর্ণভাবে একতরফা।

আরো উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্য দিবালোকে অফিস, ব্যাংক, বেসরকারি হাসপাতাল, দোকান ও গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরসহ জুম্মদের উপর হামলা সংঘটিত হয়েছে এবং হামলাকারী এসব সন্ত্রাসীদের অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসন ঘটনায় জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করেনি। দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ রয়েছে যেখান থেকে সহজে হামলাকারীদের পরিচিহ্নিত করা যায়। এমনকি দায়েরকৃত চারটি মামলায় উল্লেখিত কোন হামলাকারীকেও পুলিশ গ্রেফতারের কোন চেষ্টাও করেনি। এ থেকে নিঃসন্দেহে ধারনা করা যায়, এ হামলার ক্ষেত্রে হামলাকারী সেটেলার বাঙালিদের সাথে প্রশাসনসহ নিরাপত্তা বাহিনীর একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল।

বিগত তিন দশক অধিক কাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর কমপক্ষে দুই ডজনের মতো সাম্প্রদায়িক হামলা/গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট কোন না কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কায়েমী স্বার্থবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বানচাল করা তথা জুম্মদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণের লক্ষ্যে জঘন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে যে কোন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে অধিকতর অশান্ত করার জন্য ওৎপেতে থাকে। অতি সম্প্রতি এই গোষ্ঠী এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করার জন্য অধিকতর পরিমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রতি জুম্ম নারীদের ধর্ষণ ও হত্যাসহ সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক হামলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন ও পুলিশ (স্থানীয়) বিষয় হস্তান্তরের বিরুদ্ধে কর্মসূচি ঘোষণা ইত্যাদি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এমনিতর ষড়যন্ত্রমূলক পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিক রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পাহাড়ি-বাঙালি ছাত্রের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে উৎপেতে থাকা এই কায়েমী স্বার্থবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দ্রুত সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় বলে নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে।

এই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা তদন্তের জন্য রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য-বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্তের পর গত ১১ অক্টোবর ২০১২ জেলা প্রশাসনের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে নানা সুপারিশ পেশ করা হলেও সার্বিকভাবে প্রতিবেদনে হামলার পূর্ণাঙ্গ, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত ঘটনার বিবরণ উপস্থাপিত হয়নি। ফলে এই সাম্প্রদায়িক হামলার মূল কারণ, হামলার মূল উদ্দেশ্য ও হামলার ব্যাপকতা যেমনি যথাযথভাবে ফুটে উঠেনি, তেমনি প্রতিবেদনে হামলার মূল হোতা বা উস্কানিদাতাদের চিহ্নিত করা যায়নি। প্রকৃত সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে এ ধরনের বর্বরোচিত, মানবতাবিধ্বংসী, গণতন্ত্র পরিপন্থী নাশকতামূলক কর্মকান্ড বার বার ঘটতে থাকবে। এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র দেশের স্বার্থেও চরম ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ২৩ সেপ্টেম্বর এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়। ইউপি চেয়ারম্যানদের উপর হামলার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি জেলার ইউপি চেয়ারম্যানরা ১০ দিন কর্মবিরতি এবং ডা: সুশোভন দেওয়ানের উপর হামলার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা ১০ দিন ব্যাপী দৈনিক দুই ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। পিসিপি এ সাম্প্রদায়িক হামলার মদদদাতাদের খুজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় এবং ঘটনায় আহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণ ঐক্য, গণতন্ত্রী পার্টি, সাম্যবাদী দল, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণ আজাদী লীগ প্রভৃতি প্রগতিশীল ৭টি দলের উদ্যোগে ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি বিরোধী দাঙ্গার হোতাদের বিচার ও শাস্তি এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে' এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ

দেশের নাগরিক সমাজ এই বরর্বোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে প্রেস ক্লাবের সামনে নাগরিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও ঘটনায় জড়িত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে নাগরিক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা সাম্প্রদায়িক হামলায় উস্কানীদাতা ও হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, হামলায় আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, আইন-শৃংখলার দায়িত্বে

রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলা : ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বক্তব্য

গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা তদন্তের জন্য রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী বৃষকেতু চাকমা ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব হাবিবুর রহমান এর সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য-বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ১৬ অক্টোবর জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো' ও ১৭ অক্টোবর 'ডেইলী স্টার'-এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে একজন জুম্ম ছাত্র ও একজন জুম্ম অধিবাসীসহ ৯ (নয়) জন ব্যক্তিকে ঘটনার সাথে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধিকতর তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবেদনে শৃঙ্খলা-পরিপন্থী কাজে জড়িত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে পরিবহন সংক্রান্ত সাব-কমিটি ও আইন-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি গঠন, কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল দেয়া ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আরও সতর্ক থাকা, কলেজের একজন জুম্ম শিক্ষক ও একজন জুম্ম কর্মচারীর কার্যক্রম পযবেক্ষণ করা, কলেজে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা, ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক ও পরিচয়পত্র চালু করা, সকলের মতামতের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা, ভূমি বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া চালু করা, মিক্সড পুলিশিং ব্যবস্থা চালু করা, চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, এনজিও কার্যক্রমে বাঙালিদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়ানো ইত্যাদি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে নানা সুপারিশ পেশ করা হলেও সার্বিকভাবে প্রতিবেদনে হামলার পূর্ণাঙ্গ, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত ঘটনার বিবরণ উপস্থাপিত হয়নি। ফলে এই সাম্প্রদায়িক হামলার মূল কারণ, হামলার মূল উদ্দেশ্য ও হামলার ব্যাপকতা যেমনি যথাযথভাবে ফুটে উঠেনি, তেমনি প্রতিবেদনে হামলার মূল হোতা বা উস্কানিদাতাদের চিহ্নিত করা যায়নি। নিম্নে তদন্ত প্রতিবেদনের কতিপয় উদ্বেগজনক বিষয় তুলে ধরা হলো–

ক. হামলার মূল হোতা বা ইন্ধনদাতা

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, 'রাঙ্গামাটি শহরে সংঘটিত ঘটনায় পূর্ব পরিকল্পনার বিষয়ে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

পক্ষান্তরে কলেজ বাসের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হলেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা এবং গুজবের কারণে সমগ্র শহর এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যকার ঘটনার জের ধরে যেভাবে সেটেলার বাঙালিরা দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়ে রাঙ্গামাটি শহরের প্রায় সব এলাকায় একযোগে হামলা চালিয়েছে তাতে এটা বলা যায় যে, এ ঘটনা পূর্ব-পরিকল্পিত না হলে বা উৎপেতে থাকা সংঘবদ্ধ ইন্ধনদাতা না থাকলে কখনোই এভাবে সুপরিকল্পিত বা সংঘবদ্ধ হামলা চালানো যেতো না। বিগত তিন দশক অধিককাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জুম্ম জনগণের উপর কমপক্ষে দুই ডজনের মতো সাম্প্রদায়িক হামলা/গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট কোন না কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে। সেটেলার বাঙালি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা এই কায়েমী স্বার্থবাদী সম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যে কোন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে অধিকতর অশান্ত করার জন্য ওৎপেতে থাকে। রাঙ্গামাটি কলেজের পাহাড়ি-বাঙালি ছাত্রদের মধ্যকার ঘটনাকে এভাবে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সংঘবদ্ধ হামলা হয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিটি এই মৌলিক বিষয়টা অত্যন্ত সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে বলে বিবেচনা করা যায়।

প্রকৃত সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাদের সাহসের সাথে পরিচিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে রুখে না দাঁড়াতে পারলে এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে না পারলে এ ধরনের বর্বরোচিত, মানবতাবিধ্বংসী, গণতন্ত্র পরিপন্থী নাশকতামূলক কর্মকান্ড বার বার ঘটতে থাকবে। ফলশ্রুতিতে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র দেশের স্বার্থেও চরম ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ এর ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খ. হামলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের এড়িয়ে জুম্মদের উপর দায়ভার

তদন্ত কমিটি শুধু এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক হামলার মূলহোতা বা ইন্ধনদাতা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, হামলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়া বা নেতৃত্ব প্রদানকারীদেরও চিহ্নিত করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। একদিকে হামলাকারী সেটেলার বাঙালিদের পরিচয় অত্যন্ত সচেতনতার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে জুম্মদের পরিচিতি, হামলার সাথে জুম্মদের সংশ্লিষ্টতাকে এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে যাতে সহজেই জুম্মদেরকে হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমতঃ কলেজ পরিবহন কমিটির ঘোষিত নিয়ম ভেঙ্গে আছিফ মো: হাসান, মো: মাসুদ আলম, শিবম চৌধুরী, রাজেশ বিশ্বাস, সাইফুলসহ যেসব বাঙালি ছাত্র মোনঘর অভিমুখী বাসে করে যাওয়াতে যে সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেই বাঙালি ছাত্রদের পরিচয়ে কেবলমাত্র শ্রেণী/বর্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত বাঙালি ছাত্রদের সাথে সেদিন ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া জুম্ম ছাত্রদের মধ্যে চিহ্নিত প্রলয় দেওয়ানের পরিচিতি প্রদানের ক্ষেত্রে তার পিতার নাম, শ্রেণী/বর্ষ, রোল নম্বর, শিক্ষাবর্ষ, গ্রাম, ডাকঘর, থানা ইত্যাদি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। কলেজ বাসে যাতায়াতের নিয়মভঙ্গকারী বাঙালি ছাত্রদের বাঁচাতেই এরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর ঐ ঘটনার পর পরই বাঙালি ছাত্ররা কলেজে ফিরে এসে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেদিন ২০ সেপ্টেম্বর প্রায় ২.১৫ টার দিকে কলেজ বাসের ৪/৫টি ট্রিপ যে কলেজ ক্যাম্পাসে আটকে রাখে তার কোন উল্লেখ নেই তদন্ত প্রতিবেদনে। পরে ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বার সুজনের সাথে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কলেজ শাখার সভাপতি রনো চাকমার আলোচনার একপর্যায়ে মীমাংসার ভিত্তিতে বাসগুলো ছেড়ে দেয় বাঙালি ছাত্ররা। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, আপাত দৃষ্টিতে মীমাংসা হলেও বাস থেকে নামিয়ে দেয়ার কারণে বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলে ২২/০৯/২০১২ তারিখ উদ্ভূত ঘটনার সূত্রপাত ঘটে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরিবহন নিয়ম ভঙ্গকারী উক্ত বাঙালি ছাত্ররা জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের হামলায় জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেইসব বাঙালি ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে তদন্ত কমিটি যারপরনাই নীরব থাকে। কেবল 'বিনা প্রয়োজনে বাসে যাতায়াত অগ্রহণযোগ্য' মন্তব্য দিয়েই নিয়মভঙ্গকারী বাঙালি ছাত্রদের বিষয়ে দায়িত্ব শেষ করে তদন্ত কমিটি। পক্ষান্তরে জুম্ম ছাত্রদের কর্তৃক পরিবহন নিয়ম ভঙ্গকারী বাঙালি ছাত্রদের বাস থেকে নামিয়ে দেয়াকে 'আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার সামিল' বলে জুম্ম ছাত্রদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করে।

দ্বিতীয়ত: তদন্ত কমিটি রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় হামলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী সেটেলার বাঙালিদের পরিচিহ্নিতকরণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তদন্ত কমিটি হামলায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৯ ব্যক্তিকে পরিচিহ্নিত করলেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় হামলাকারী শত শত সেটেলার বাঙালিদের কাউকে চিহ্নিত করেনি। প্রকাশ্য দিবালোকে অফিস, ব্যাংক, বেসরকারি হাসপাতাল, দোকান ও গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরসহ জুম্মদের উপর হামলা সংঘটিত হয়েছে এবং হামলাকারী এসব সন্ত্রাসীদের মধ্যে অনেককেই অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ ও স্থিরচিত্র রয়েছে যেখান থেকে সহজেই হামলাকারীদের পরিচিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, তদন্ত কমিটি ঘটনায় জড়িত কাউকেই পরিচিহ্নিত করতে পারেনি। এমনকি কোতোয়ালী থানায় দায়েরকৃত চারটি মামলায় উল্লেখিত কোন হামলাকারীকেও তদন্ত কমিটি পরিচিহ্নিতকরণ বা গ্রেফতারের কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশও করেনি। উদাহরণস্বরূপ, ২৩ সেপ্টেম্বর দীনেশ তঞ্চঙ্গ্যা নামে একজন যুবককে হাসপাতাল রোডে মো: মামুন ওরফে বাপ্পী, মো: রুবেল ওরফে মধু, মো: সোহেল ও মো: আনারুলের নেতৃত্বে ১০/১২ জন সেটেলার বাঙালি হামলা

চালিয়ে জখম করে যাদের নাম কোতোয়ালী থানায় দায়ের করা মামলায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিটি এ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেনি। এ থেকে নিঃসন্দেহে ধারনা করা যায়, হামলাকারী সেটেলার বাঙালিদের পেছনে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর একটি প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে যে কারণে তদন্ত কমিটি হামলাকারীদের পরিচিহ্নিতকরণে সাহস ও দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত: তদন্ত কমিটির পরিচিহ্নিত ৯ জনের মধ্যে ৭ জন বাঙালি ও ২ জন জুম্ম। সাত জন বাঙালিদের মধ্যে ফরহাদ, ফরিদুল ইসলাম ও মো: মানিক নামে তিন জনের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ২০০৫, ২০০৮ ও ২০০৬ সালে কোতোয়ালী থানা মামলা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। আর দু'জন জুম্মদের মধ্যে বিদ্যুৎ চাকমা নামে ব্যক্তিটি একজন মাদকসেবী হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, কেবলমাত্র দায় এড়াতেই তদন্ত কমিটি এমন সব ব্যক্তিকে পরিচিহ্নিত করেছে যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজবিরোধী অথচ যাদেরকে চিহ্নিত করলেই কোন মহলই আপত্তি করবে না। আর জুম্মদের মধ্যে আরেকজন হচ্ছে ইমন চাকমা, যিনি রাঙ্গামাটি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইমন চাকমা ২০৯ শ্রেণীকক্ষে হামলার শিকার জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একজন। ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০:১৫ টার দিকে একদল বাঙালি ছাত্র-যুবক কর্তৃক যে শ্রেণীকক্ষে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর যে একতরফা হামলা চালানো হয়, তখন ইমন চাকমাও অন্যান্য নিরীহ ছাত্রদের ন্যায় ঐ শ্রেণীকক্ষে বসে পাঠগ্রহণ করছিলেন। হামলা থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় তিনিও পালানোর চেষ্টা করেন এবং পালানোর সময় তিনি হামলাকারিদের লাঠির আঘাতে জখম হন। অথচ তদন্ত কমিটি তাকেই হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং পরিতোষ বড়ুয়া নামে জনৈক কলেজ ছাত্রের দায়ের করা মামলার আমলে নিয়ে ইমন চাকমাকে পরিচিহ্নিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও অন্যান্য হামলাকারীদের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কোতোয়ালী থানায় দায়েরকৃত অন্যান্য মামলাগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দৃষ্টিগোচর হয়নি। তদন্ত কমিটি ইমন চাকমাকে বহিষ্কারের সুপারিশ প্রদান করেছে। অথচ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ইহাও উল্লেখ আছে যে, বাঙালি ছাত্ররাই আগে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা করেছে। অথচ এসব হামলাকারী বাঙালি ছাত্রদের কাউকেই দায়ী করা হয়নি। পক্ষান্তরে হামলার শিকার একজন নিরীহ ইমন চাকমাকে কলেজে সংঘটিত গোটা ঘটনারই একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে। এর চেয়ে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব আর কি থাকতে পারে!

তৃতীয়ত: তদন্ত প্রতিবেদনে জুম্মদেরকেও হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত ঘটনাটি সেটেলার বাঙালি ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের উপর একতরফা হামলা। এটি কোনভাবেই তথাকথিত 'পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ' নয়, যা তদন্ত কমিটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উল্লেখ করেছে। বলাবাহুল্য এ ঘটনায় জুম্মরা কখনো কোথাও বাঙালি বসতির উপর হামলা করতে যায়নি বা বাঙালিদের ঘরবাড়ি, দোকানপাত বা কোন প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করেনি। জুম্মরা নিজেদের এলাকায় নিজেদের জানমাল রক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বিশেষ করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জুম্মরা সেটেলার বাঙালিদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। যেমন বনরূপা এলাকায় জুম্মরা চৌমুহনী থেকে সমতা ঘাটের রাস্তা বরাবর শূকরের মাংস বিক্রির স্থানে জড়ো হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্যারিকেড তৈরি করে। অথচ সেই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে 'ওয়ান ব্যাংক ভবনের ছাদ ব্যবহার করে জুম্মরা বনরূপা চৌমুহনীতে সেটেলার বাঙালিদের উপর ইট-পাথর নিক্ষেপ করে' বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ৯.০০ ঘটিকার দিকে টিটিসি ও রাজবন বিহার এলাকায় জুম্মরা লাঠিসোটা নিয়ে একত্রিত হয় বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, যা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

গ. সব ব্যর্থতার দায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ও কতিপয় কলেজ শিক্ষকের উপর চাপানো

তদন্ত প্রতিবেদনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার সব দায় রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ দু'জনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়ে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছের বলে উল্লেখ রয়েছে। মারামারি শুরু হলে কিছু ছাত্রছাত্রী অধ্যক্ষের কাছে গেলে অধ্যক্ষ তাদেরকে ২য় তলায় যেতে পরামর্শ দেন এবং সেখানে গিয়ে তারা পাহাড়ি ছেলেদের আক্রমণের শিকার হয় বলে অধ্যক্ষ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। অথচ অধ্যক্ষ মহোদয় ছাত্রছাত্রীদের ২য় তলায় যাওয়ার কোন পরামর্শ দেননি বলে জানা যায়। এমনকি অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজে মোতায়েনকৃত পুলিশ ফোর্সকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি বলে তাঁর বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ আনা হয়। অথচ উক্ত পুলিশ ফোর্স পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের দায়দায়িত্ব অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট থাকার কথা নয়।

অপরদিকে কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ত্রিবিজয় চাকমা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের দপ্তরী কানন চাকমা কর্তৃক পাহাড়ি ছাত্রদের হাতে লাঠি তুলে দেয়ার সরাসরি অভিযোগ আনা হয় প্রতিবেদনে, যা তারা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। জানা যায় যে, ২২ সেপ্টেম্বর হামলা চলাকালে ত্রিবিজয় চাকমা ৩য় তলায় ৩০৬ নম্বর কক্ষে নির্বাচনী পরীক্ষা হলে ব্যস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ ত্রিবিজয় চাকমা উদ্যোগ নিয়ে কলেজ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিস্থিতি বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের বানোয়াট ও পক্ষপাতিত্ব অভিযোগ আনা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে অভিযুক্ত কানন চাকমা হামলা চলাকালে ৩১০ নম্বর কক্ষে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা হলে ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি কক্ষ থেকে বেরও হননি বলে জানা গেছে। এছাড়া কলেজের যে কক্ষ থেকে ঘটনার সূত্রপাত, ঘটনার সময় সেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানরত শিক্ষক প্রভাষক সমীর কুমার নাথের বিরুদ্ধেও নির্বুদ্ধিতা ও দায়িত্বহীনতার একপেশে অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কলেজ প্রশাসনের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষসহ কলেজ কর্তৃপক্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যেখানে শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, প্রভাবশালী

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মদদপুষ্ঠ একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি কলেজের ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা নিঃসন্দেহে অসম্ভব ছিল। এক্ষেত্রে বরঞ্চ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ প্রশাসনের দ্রুত ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপই ছিল প্রধান এবং এক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে তারা চরম ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছে। তদন্ত কমিটি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ প্রশাসনের এই ব্যর্থতার সব দায়ভার কলেজ কর্তৃপক্ষ ও কতিপয় কলেজ শিক্ষকের উপর চাপিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষগুলোকে দায়মুক্ত করানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে বলে মনে করা যায়।

ঘ. প্রশাসন/পুলিশ/নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে প্রশংসার স্তুতি

তদন্ত প্রতিবেদনে সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ প্রশাসনের ভূমিকাকে ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে আয়োজিত জরুরি বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা সভায় সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সহিংস ঘটনা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে এবং আগামীতে এ ধরনের ঘটনা রোধে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, সেনাবাহিনী ভূমিকা না নিলে পুলিশের একার পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কঠিন হয়ে পড়তো এবং ঘটনা আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তো। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ ধরনের নারকীয় সাম্প্রদায়িক হামলায় সেটেলার বাঙালিরা যেভাবে একটি প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সর্বাত্মক মদদ ও সমর্থন লাভ করে তাতে করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য বিজিবিসহ নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে। ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে ৯-১০ টার দিকে সেটেলার বাঙালিরা পূর্ব ট্রাইবাল আদাম ও রাজমনি পাড়া আক্রমণ করতে গেলে সেনাবাহিনী/বিজিবিসহ প্রশাসন যেভাবে আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করেছে এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসীয়। পক্ষান্তরে ইহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ২২ সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা জারী থাকা অবস্থায় সেটেলার বাঙালিরা রাঙ্গামাটির বিভিন্ন স্থানে হামলা করতে আসলে সে সময় সেনাবাহিনী/বিজিবিসহ প্রশাসন হামলা করাসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে সেটেলার বাঙালিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারতো। তাতে করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতো এবং পরবর্তীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সাম্প্রদায়িক হামলা চালাতে কেউ সহজে সাহস করতো না। কিন্তু সেনাবাহিনী/বিজিবিসহ প্রশাসন সেদিকে মোটেই অগ্রসর হয়নি যা তাদের চরম ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে।

অপরদিকে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ঘটনা শুরুর পর অনেক দেরিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মোতায়েনের পর কলেজ এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের ছত্রভঙ্গ করলেও শহরের অন্যান্য এলাকায় পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের পরই রাঙ্গামাটি শহরের প্রধান সড়ক বরাবরই প্রকাশ্য দিবালোকে বেশির ভাগ অফিস, দোকান ও গাড়িতে হামলা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগারে হামলা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের অনেক পরে বেলা ২-৩টার দিকে। এসবের উপর হামলা চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিরোধের কোন ভূমিকা নেয়নি। ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে পূর্ব ট্রাইবাল আদাম ও রাজমনি পাড়ায় আক্রমণে যাওয়া সেটেলার বাঙালিদের যেভাবে সেনাবাহিনী/বিজিবিসহ প্রশাসন মোকাবেলা করেছে সেভাবে যদি ২২ সেপ্টেম্বর সকালে কলেজের ঘটনার পর পর সেনাবাহিনী ও প্রশাসন দ্রুততার সাথে রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন এলাকায় যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতো তাহলে সেদিন তবলছড়িসহ শহরের প্রধান সড়ক বরাবর সেটেলার বাঙালিরা বাজারে আসা জুম্মদের উপর বা জুম্মদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর এত ব্যাপক আকারে হামলা করতে পারতো না বা সেটেলার বাঙালিদের একতরফা তান্ডবলীলা রোধ করা যেতো। সার্কিট হাউজের সভায় এ ধরনের ঘটনা রোধে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হলেও ২৩ সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা জারী থাকা অবস্থায় হাসপাতাল এলাকায় দীনেশ তঞ্চঙ্গ্যা নামে একজন জুম্মকে সেটেলার বাঙালিদের হামলা রোধ করতে বা মামলা দায়েরের পরও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

আরো অভিযোগ রয়েছে যে, সেদিন ২২ সেপ্টেম্বর কলেজের ঘটনার পর পর রাঙ্গামাটি শহরের প্রধান সড়ক বরাবর হামলাকারী সেটেলার বাঙালিদের ছত্রভঙ্গ না করে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা লাঠিসোটা নিয়ে বনরুপা, কল্যাণপুর, দেবাশীষনগরসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় জুম্মদেরকে ধাওয়া করে এবং নারী-শিশু নির্বিচারে জুম্মদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এর ফলে একদিকে জুম্মদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, অন্যদিকে প্রধান সড়ক বরাবর জুম্মদের বা জুম্মদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর অবাধে হামলা চালাতে প্রকারান্তরে সেটেলার বাঙালিদের সুযোগ করে দেয়া হয়। এমনকি সংগৃহীত স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজে নিরাপত্তা/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে কোন কোন এলাকায় সেটেলার বাঙালিরা হামলা করেছে বলেও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত ইহা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, নিরাপত্তা বাহিনীসহ প্রশাসনের এই চরম ব্যর্থতাকে তদন্ত প্রতিবেদনে বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রশাসন কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির পক্ষে প্রশাসনসহ নিরাপত্তা বাহিনীর চরম ব্যর্থতাকে প্রতিবেদনে তুলে ধরার মতো সাহস বা নিরপেক্ষতা যে থাকবে না তা বলাই বাহুল্য।

ঘ. পাহাড়ি-বাঙালির ক্ষোভ ও চাঁদাবাজির অজুহাতে এ ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াস

জুম্মদের উপর একতরফা সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে উদ্ভত ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে পাহাড়ি-বাঙালিদের ক্ষোভ, চাঁদাবাজি, এনজিও কার্যক্রমে বাঙালিদের সীমিত অংশগ্রহণ, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন ও পার্বত্য জেলা পরিষদে পুলিশ বিষয় হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়গুলো যা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলনসহ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী

জনসংহতি সমিতির বক্তব্য : ৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

আদিবাসী বিরোধী সরকারি চিঠি জারীর ফলে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও কতিপয় স্থানে পুলিশী বাধাদানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে আদিবাসী জনগণ ও দেশের নাগরিক সমাজ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ও বিভিন্ন দাবিনামাকে সামনে রেখে ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করেছে। অন্যান্য বছরের মতো আদিবাসী জনগণ ও দেশের নাগরিক সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে আদিবাসী দিবস পালনের উদ্যোগ নিলেও এ বছর আদিবাসী দিবসের কর্মসূচিতে সরকারি সহযোগিতা প্রদান না করার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত চিঠির কারণে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে এবং জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই জেলায় আদিবাসী দিবসের কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দান ও এমনকি জয়পুরহাটে পুলিশ আদিবাসীদের লাঠিপেটার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ২০১২ সালের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices"-এর সাথে সঙ্গতি রেখে 'আদিবাসী অধিকার উজ্জীবিতকরণে আদিবাসী গণমাধ্যম' এই শ্লোগানকে সামনে এ বছর সারাদেশে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঢাকায় ২ আগস্ট ২০১২ সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ৯ আগস্ট সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আদিবাসী দিবসের মূল অনুষ্ঠান– সমাবেশ ও র‍্যালি আয়োজন করে। উক্ত সমাবেশ ও র‍্যালি উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও আদিবাসী ককাসের আহ্বায়ক জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব শওকত আলী এমপি উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি অনুপস্থিত থাকেন। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে সমাবেশ, র‍্যালি ও মানববন্ধনের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরে–

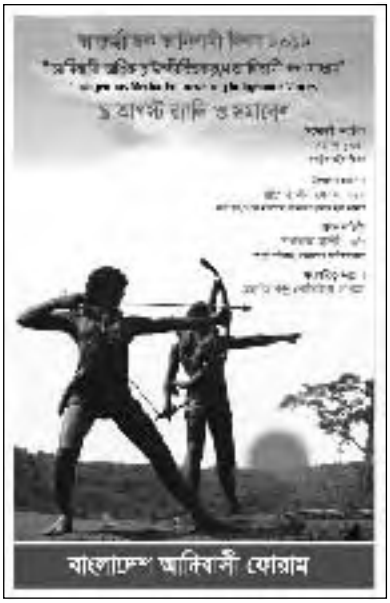

১. আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে–
   ক) সংবিধানে একটি নতুন তফসিল সংযোজনের মাধ্যমে ৫৪টির অধিক ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহের নামের তালিকা সন্নিবেশকরণসহ আদিবাসীদের জাতিসত্তা ও মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।
   খ) সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর '২৩ক।' অনুচ্ছেদের 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের' পরিবর্তে 'আদিবাসী জাতিসমূহের' শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা।
   গ) ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (সংশোধন) সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
   ঘ) সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ৬নং অনুচ্ছেদ হতে 'জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং' শব্দাবলী বাতিল করা।
   ঙ) সংবিধানের পঞ্চদশ সংবিধানের 'বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংক্রান্ত সম্বলিত ধর্মাশ্রয়ী বিধানাবলী বাতিল করা।
২. আইএলও ১০৭ ও ১৬৯ নং কনভেনশন এবং ২০০৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান;
৩. আদিবাসী ও জনজাতি (ট্রাইবাল) বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অবিলম্বে অনুস্বাক্ষর করা;
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে যথাযথ বাস্তবায়ন করা এবং এলক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা;
৫. আদিবাসী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আদিবাসীদের স্বাধীন মতামত গ্রহণ এবং প্রকল্পে আদিবাসীদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৬. বেহাত হওয়া সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জায়গা-জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করা;
৭. দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদের আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা;
৮. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন ২০১২ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ সংশোধন করা;
৯. আদিবাসী অধিকার আইন প্রণয়ন করা এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক কমিশন গঠন করা;
১০. জাতিসংঘ ঘোষিত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা।

আদিবাসী দিবসের কর্মসূচিতে পুলিশী বাধা ও হামলা:

জানা যায় যে, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে আদিবাসী দিবস উপলক্ষে জয়পুরহাট জেলা পরিষদের মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও র‍্যালিঅনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হলে পুলিশ আদিবাসীদের বাধা দেয় এবং কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না বলে নির্দেশ দেয়। আদিবাসীরা ঐ স্থান থেকে র‍্যালি বের করতে চাইলে তাতেও পুলিশ বাধা দেয়। এক পর্যায়ে আদিবাসীরা মিছিল শুরু করার চেষ্টা করলে পুলিশ আদিবাসীদের কাছ থেকে ব্যানার কেড়ে নেয় এবং লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করতে থাকে। এতে আদিবাসী যুব পরিষদের সভাপতি হরেন্দ্রনাথ সিং ও আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সদস্য লাল মোহন এক্যাসহ ৯ জন আদিবাসী জখম হয়। রাইফেলের বাটের আঘাতে লাল মোহন এক্যার একটি হাত গুরুতরভাবে জখম হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

অন্যদিকে খাগড়াছড়ি জেলা শহরে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, মারমা ঐক্য পরিষদ ও প্রগতিশীল মারমা ছাত্র সমাজ পূর্ব-ঘোষিত র‍্যালি বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে র‍্যালি অনুষ্ঠান বাতিল করে আদিবাসীরা স্ব স্ব স্থানে সমাবেশের মধ্য দিয়ে আদিবাসী দিবসের কর্মসূচি সমাপ্ত করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে জেলা সদরে অনুষ্ঠেয় আদিবাসী দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য মহালছড়ি ও পানছড়ি থেকে কাউকে আসতে দেয়া হয়নি। বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়িতে স্থানীয় আদিবাসীরা আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য রোয়াংছড়ি উপজেলা মিলনায়তন ভাড়া করা হলেও পুলিশ উক্ত মিলনায়তনে অনুষ্ঠান করতে দেয়নি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহারে পুলিশ বাধা দেয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ৯ আগস্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণার পর থেকে প্রত্যেক বছর বাংলাদেশে আদিবাসী জনগণ ও দেশের নাগরিক সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে পালন করে আসছে এবং সরকারিভাবে পালন করা না হলেও কোন সরকারই আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করেনি। আরো উদ্বেগজনক বিষয় যে, গোয়েন্দা বাহিনীর একটি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রথমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে আদিবাসী দিবসের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা, সহযোগিতা প্রদান না করা এবং আদিবাসী বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন স্তরের প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইসতেহারে 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে' বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করে তাদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ এই সরকারের আমলে আদিবাসী দিবস বিরোধী সার্কুলেশন জারী করা, আদিবাসী দিবসের শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করা এবং আদিবাসীদের উপর বর্বরোচিত পুলিশী হামলা ইত্যাদি বৈষম্যমূলক আচরণ কখনো কাম্য ছিল না। আদিবাসী জনগণসহ দেশের নাগরিক সমাজ এই সরকারের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই সাথে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যুকৃত আদিবাসী দিবস সংক্রান্ত সার্কুশেলন অচিরেই প্রত্যাহার, আদিবাসীদের উপর হামলায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, আহত আদিবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা প্রদান এবং এহেন আচরণের জন্য সরকারের তরফ থেকে আদিবাসীদের নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য জোর দাবি জানিয়েছে।

জনসংহতি সমিতির বক্তব্য

(৬১ পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃক উত্থাপিত হয়ে থাকে সেসব বিষয়গুলো তদন্ত প্রতিবেদনে উত্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু সুপারিশমালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও 'সকলের মতামতের ভিত্তিতে' পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে বলে বিভ্রান্তিকর ও ষড়যন্ত্রমূলক সুপারিশ করা হয়েছে। আর কোন যৌক্তিকতা বা কার্যকারণ ব্যাখ্যা ব্যতীত আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে যা অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়। তদন্ত কমিটির উত্থাপিত এসব বিষয়গুলো প্রকারান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে বলে বলা যেতে পারে।

বলাবাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভারে এই চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নানাভাবে অচলাবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে। ২২-২৩ সেপ্টেম্বর সংঘটিত হামলার প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে অচলাবস্থার মধ্যে রাখার চলমান নীতিরই ধারাবাহিকতা বলে নিঃসন্দেহে বিবেচনা করা যায়।

কক্সবাজার (রামু/উখিয়া/টেকনাফ) ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে 'অসাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ চাই'-এর ব্যানারে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ১৯ অক্টোবর ২০১২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে আয়োজিত

সম্প্রীতি ও প্রতিবাদ সমাবেশের ঘোষণাপত্র

গেলো ২৯-৩১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও পটিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও বসতবাড়িতে যে পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে তাতে আমরা যারপরনাই মর্মাহত ও লজ্জিত; সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির উলম্ফন ও তাণ্ডবলীলা দেখে একই সঙ্গে আমরা বিচলিত ও শঙ্কিতও; প্রেম, মানবতা, ক্ষমা, অহিংসা, শিক্ষা, সভ্যতা– এই হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূল বাণী। বাংলাদেশে দশ লাখ বৌদ্ধ বাস করেন, ছয় লাখ সমতলে আর চার লাখ পাহাড়ে; অহিংস নীতির উপর স্থাপিত যে বৌদ্ধ ধর্ম, শান্তিপ্রিয় সেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর এহেন ন্যাক্কারজনক ও ঘৃণ্য-পরিকল্পিত হামলার ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। গণমাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ আর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ যতোটুকু এসেছে সরেজমিনে দেখে মনে হয়েছে তা দশভাগের এক ভাগও না! এ ঘটনায় সুকৌশলে যথাসম্ভব প্রাণহানি এড়িয়ে বৌদ্ধ সভ্যতা ও ঐতিহ্যের কিছু দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য দলিল ধ্বংস করা হয়েছে; লুট করা হয়েছে স্বর্ণ নির্মিত ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি, বিহার অধ্যক্ষের পাসপোর্ট, দানবাক্সের টাকা; শত শত বছরের পুরোনো বিহার, বুদ্ধমূর্তি, তালপাতায় লেখা ত্রিপিটক, বুদ্ধধাতুসহ অমূল্য সম্পদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠ, মন্দির, বিহার, বাড়ি, পানির কল, কম্পিউটার, সনদপত্র, জমির দলিল, যাদুঘর, সংগ্রহশালা সব এখন জ্বলন্ত অঙ্গার। পিতলের মতো কঠিন পদার্থ গলে পিণ্ড হয়ে গেছে, গাছের ডাব পুড়ে গিয়ে নারকেলের রঙ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের বাইরে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশসমূহে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে, বাকি বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা থেকে বিযুক্ত করা ও পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ, আমরা মনে করি, গণহত্যার চেয়েও ভয়াবহ। মৌলবাদ যে মূর্খ, সাম্প্রদায়িকতা যে অন্ধ-আদিম, ধর্মান্ধতা যে অযৌক্তিক– এর অবস্থান যে জ্ঞান, বিবেক, সভ্যতা আর যুক্তির বিরুদ্ধে– এটি যে জীবনের বিরুদ্ধে, মানুষের যা কিছু শুভ তার বিরুদ্ধে– এ ঘটনায় তা এক লাফে বেরিয়ে এসেছে।

ট্রাকভর্তি দুর্বৃত্তরা এসে রামুর বৌদ্ধমন্দিরে হামলা চালানোর আগেই এ নাশকতার পূর্ব প্রস্তুতি চলছিল। পোস্টারিং হয়েছে, মাইকিং হয়েছে, হয়েছে মিছিল মিটিং এবং সে সকল মিছিল মিটিং সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত অবধি হয়েছে যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মধ্যরাতের পর থেকে ভোর রাত পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবহিত থাকলেও তারা নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, যা বহুবিধ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক দোষারোপ, রাজনীতির নানা চোরাপথ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কগুলোর জটিল বিন্যাস, র‍্যাব-পুলিশ ও জনপ্রশাসনের বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সীমাহীন ব্যর্থতায় আমরা যারপরানাই ক্ষুব্ধ। আমরা দেখেছি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই থানা থেকে বিহার/ বসতবাড়ির দূরত্ব ছিল অত্যন্ত স্বল্প। এমনকি ঘটনার পরের দিন পটিয়া ও উখিয়ায় বৌদ্ধবিহারসহ হিন্দু মন্দিরে হামলা করা হলেও প্রশাসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। পটিয়ায় একটি শিপিং কোম্পানি থেকে শ্রমিকরা এসে বিহার হামলা চালিয়েছে, রামুতে কক্সবাজার শহর থেকে ট্রাকভর্তি লোক অস্ত্র, রামদা নিয়ে এসে বিহার ও বাড়িঘরে গান পাউডার ছিটিয়ে পেট্রোল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে, যা নিশ্চিতভাবে পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়েছে। সাম্প্রতিক মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর বৌদ্ধদের হামলার কারণে এ অঞ্চলে মুসলিমদের মধ্যে এমনিতেই

একটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছিল। একে আরাকান সহিংসতার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে; এ ঘটনায় রোহিঙ্গাদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ আছে বলে মানুষের ধারণা; এ ধরনের আক্রমণের একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতিও থাকে; সংখ্যালঘুদের তাড়িয়ে দিয়ে সহজেই তাদের ভিটেমাটি দখল করা যায়; পর্যবেক্ষণ বলে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ, আশ্রয়, বসবাস, জীবন-জীবিকা এ অঞ্চলের সমস্যাকে ঘণীভূত ও জটিল করেছে, এ কারণে আমরা জনমিতির রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্য পরিকল্পনা সম্পর্কেও সজাগ থাকা জরুরি বলে মনে করছি। চার লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা, যারা উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এখানে আছে, ইতোমধ্যে তাদের অনেক স্বার্থগোষ্ঠীও তৈরি হয়ে গেছে। পাশাপাশি এতদঅঞ্চলে বহুদিন ধরেই মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠীর কর্মতৎপরতার খবর আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাচ্ছি, পাচ্ছি গহীন অঞ্চলে মৌলবাদী সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনগুলোর প্রশিক্ষণকেন্দ্র থাকার খবরও; রোহিঙ্গারা এমনকি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কাছে তাদের জন্য বাংলাদেশের মাটিতে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের দাবিও জানিয়েছে।

মানুষের ধারণা খুবই স্পষ্ট যে, সাম্প্রতিক এই সহিংসতার জন্য দায়ী উগ্র মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-জিঘাংসার শিকার এসব মানুষ এখন তীব্র আতঙ্কে আছে; উগ্র ধর্মীয় মানসিকতা সম্পন্ন আক্রমণকারীরা আর সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধ্বজাধারীরা এখনও আক্রান্ত মানুষদের হুমকি-ধামকি দিয়ে চলেছে। আমরা গভীরভাবে বিচলিত এই কারণে যে, এই নির্মম ধ্বংসলীলা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন নয়; এর আগে সাতক্ষীরা, হাটহাজারি, চিরিরবন্দর, রাঙ্গামাটিসহ বিভিন্ন সময়ে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন হয়েছে সেইসব পূর্বাপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সঙ্গে এর যোগ আছে; স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সুকৌশলে ধর্মান্ধতাকে এ ক্ষেত্রে উসকে দিয়েছে; মানুষের ধারণা এর পেছনে আছে জামায়াত-শিবির-রোহিঙ্গাগোষ্ঠী ও বিদেশী অর্থায়নে চালিত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক এনজিওদেরও সংশ্লিষ্টতা; জামায়াত-রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ধর্মান্ধ জনতাও এ আগুনে ঘি ঢেলেছে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন বিজিবি, সেনাক্যাম্প, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিল। প্রতেকটি বিহারে যাতায়তের পথও বেশ সুগম। এ হামলা তাই অতর্কিত নয় তবু কেউই ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু বৌদ্ধরা হামলার বিষয়ে অপ্রস্তুত ছিল কারণ তারা পূর্বে কখনও এর শিকার হয়নি এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে তাদের নিরাপত্তার কোনো সমস্যা হবে না। কাজেই প্রকৃত তথ্য ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ থাকলেও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়নি। উপরন্তু বর্তমানে এ প্রশাসনের হাতেই পুনর্বাসনের কাজ চলছে। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসভায়ও হামলাকারীদের অনেককে দেখা গেছে। স্বরাষ্টমন্ত্রীর অকুস্থল পরিদর্শনের পরেও, ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও পুনরায় হামলা হয়েছে। কাজেই স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় এখন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন এবং তাদের মনোজগতে ভয়ংকর আস্থাহীনতা বিরাজ করছে। স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় হামলাকারীদের অনেককে চিনলেও ভয়ে কারো নাম বলতে চাইছেন না। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, এ হামলার ঘটনা রোধে সরকারের দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ এ হামলা রোধে যদি উপর থেকে আদেশ না গিয়ে থাকে তবে এর দায়ভার সরকারের আর যদি আদেশ যাওয়ার পরও কাজ না হয় তাহলে এ ব্যর্থতা আরও ভয়াবহ।

এর আগে রাঙ্গামটি শহরে ২২-২৩ অক্টোবর আদিবাসী পাহাড়ি জনগণ জাতিগত নিপীড়নের এক ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। কলেজ বাসে সিটে বসার মতো তুচ্ছ ঘটনাকে পুঁজি করে পুরো রাঙামাটি শহর জুড়ে চলানো হয় ব্যাপক তাণ্ডব। একের পর এক পাহাড়ি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়িতে ভাংচুর চালানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয় এবং বিশ্রামাগারও ভাংচুর চালানো হয়। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইউপি চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন পাহাড়ি চেয়ারম্যানকে আহত করা হয়। রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সুশোভন দেওয়ানকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বর্বরভাবে আক্রমণ করা হয়। তার একটি চোখ উপড়ে ফেলা হয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এই সকল সহিংস ঘটনাবলী সংঘঠিত হয় প্রকাশ্য দিনের বেলায় এবং জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলোতে। যখন এই সহিংসতা সংঘটিত হচ্ছিল তখন আইন-শৃংখলা বাহিনী ছিল ভয়ংকরভাবে নিশ্চুপ। আরও উদ্বেগের বিষয় সেনাবাহীনীর সদস্যরা পাহাড়ি জনগণের বাসায় বাসায় গিয়ে হামলা চালায়, পাহাড়িদের দোকানপাটেরও ব্যাপক ক্ষতি করে। সেই দিন প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথেও সেনাসদস্যরা উদ্ধত ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। প্রশাসন ২২ অক্টোবর ১৪৪ ধারা জারী করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা মধ্যেও দাঙ্গাকারী বাঙালিরা মিছিল সহকারে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই সময় প্রশাসনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এরকম ধারাবাহিক জাতিগত ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে আমরা দাবি জানাচ্ছি:

১) রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরতা পরিহার করে সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান করে রামু, উখিয়া ও পটিয়ার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক; দলমত নির্বিশেষে হামলাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, দ্রুত বিচার আদালতে তাদের বিচার করা হোক; তদন্তের নামে নিরপরাধ মানুষকে অযথা গ্রেফতার বা হয়রানি বন্ধ করা হোক; পাশাপাশি সরকার ও প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা চক্রান্তকারীদের চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে; **২)** রামু, উখিয়া ও পটিয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, তার প্রতিবিধান ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে হবে; দ্রুত সকল বিহার/মন্দির সংস্কার ও বাস্তুচ্যুত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষকে পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; বৌদ্ধ বিহার সমূহের হুবহু পুনর্নির্মাণের জন্য ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যরীতি মেনে সংস্কার করতে হবে ও উপকরণ ব্যবহারে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; **৩)** রামু, উখিয়া ও পটিয়ায় ভস্মীভূত আর্টিফেক্ট সংগ্রহ করে যাদুঘর/সংগ্রহশালা

বানাতে হবে যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বর্বরোচিত রূপটি দেখে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে নির্মাণে কাজ করতে পারে; **৪)** দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসেবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ জাতিগত ও সংখ্যালঘু অপরাপর জনমানুষদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে হবে; তাদের আস্থা ও নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে হবে; এ কারণে এ অঞ্চলসহ পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষদের মনে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতার অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতির সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সরকার, রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটিসহ সবাইকে দীর্ঘমেয়াদে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে; **৫)** সাংবিধানিকভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে এবং **৬)** প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে।

আমরা মনে করি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে তা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। কারণ প্রকৃত দোষীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত না করলে, পর্যাপ্ত পুনর্বাসন ও ক্ষয়ক্ষতির সংস্কার না হলে এবং সর্বোপরি সম্পর্কের উন্নয়ন তথা আস্থার পুনরুদ্ধার না হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে এবং সামনে যে আরও বড় কোনো ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে না সে আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ওই অঞ্চলের সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছেন; আগুনে অঙ্গার হয়েছে অনেক কিছুই; পাঁচ বছর বয়সী তিথির বই পুড়েছে, আশি বছরের বুচি শর্মা দগ্ধ হয়েছেন, পুড়েছে বিহারের কাঠ এবং অসংখ্য ভিক্ষুর পরনের চীবর; টাকা পেলে পোড়া স্থানে বিহার হবে, আবার বই পাবে তিথি; ভিক্ষুরাও পাবেন চীবর; কিন্তু শত কোটি টাকা দিয়েও আর ফিরিয়ে আনা যাবে না তাল পাতায় লেখা শত বছরের পুরনো ত্রিপিটক; পাওয়া যাবে না কয়েক শ' বছরের বৌদ্ধদের বুদ্ধ ধাতু এবং বৌদ্ধের বক্ষাস্থি দিয়ে তৈরি স্বর্ণ ব্রোঞ্জ ও পিতলের শতাধিক আবক্ষ মূর্তি; আর তার চেয়েও যে বড় যে মানসিক ক্ষতি তা তো কখনই পেষানোর নয়! তবু অবশ্যই দীর্ঘদিনের প্রয়াসে গড়ে তোলা এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, রক্ষা করতে হবে দেশে-বিদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের সংকাটাপন্ন ভাবমূর্তি। কারণ বাংলাদেশের জন্য সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী পরিচয়টি মূল ও চূড়ান্ত হয়ে গেলে রাষ্ট্রের জন্য তা সমূহ বিপদের কারণ। এ কারণেই সাম্প্রতিক এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে আমরা চিহ্নিত করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর সরাসরি আক্রমণ হিসেবে; এই আক্রমণ গণতন্ত্রের ওপর, মানবিক মূল্যবোধের ওপর, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর; এটি জ্ঞান, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার ওপর অন্ধ-আক্রমণ; এমনকি একাত্তরেও পাক হানাদার বাহিনী বৌদ্ধবিহারে এরকম আক্রমণ করেনি, যা কিনা করা হলো স্বাধীন এই বাংলাদেশে! আমরা চাই হিংসা-বিদ্বেষ-বিবাদের চির অবসান হোক। কারণ এটি মেনে নেওয়াই তো ভয়ংকর কষ্টকর যে, একুশ শতকে এসেও পৃথিবীটা ধর্মের ভেদরেখা দিয়ে বিভাজিত হচ্ছে। এ জন্য প্রগতিশীল মানুষদের সমন্বয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বোপরি রাষ্টকে ধর্ম থেকে বিযুক্ত করার যে সত্যিকার সেক্যুলার স্পিরিট তাকে সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সমুন্নত রাখতে হবে।

রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলা

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা দায়িত্ব অবহেলা বা উস্কানি প্রদান করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা, দেশব্যাপী আদিবাসীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, উচ্ছেদ, ধর্ষণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ভূমি দখল বন্ধ করার দাবি জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশন এ হামলার প্রতিবাদে ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করে এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটিও এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২২ সেপ্টেম্বর এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবাদ

এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সিএইচটি-আমেরিকান জুম্ম পিপলস এসোসিয়েশন এ ঘটনার প্রতিবাদে ২৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনের সভাপতি মংথোয়াই নুচিং ও সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ চাকমা স্বাক্ষরিত একটি চিঠি বাংলাদেশে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটিশ প্রভৃতি বৈদেশিক মিশনের নিকট প্রেরণ করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবাধিকার অধ্যয়ন কেন্দ্র থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকলিপিতে উক্ত কেন্দ্রের শিক্ষক অধ্যাপক মারি এ্যানে কেনি, ড. ক্যারোলিন ফ্লেয়ারী, ড. লিন্ডা ব্লানচাদ, ড. লিসা হার্টলে ও ফিয়ানি ম্যাকগুচে স্বাক্ষর করেন। ভারতের আসাম-ভিত্তিক 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ইন্ডিজিনাস ট্রাইবাল পিপল' ২৭ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

নিউইয়র্ক-ভিত্তিক 'আমেরিকান জুম্ম কাউন্সিল' ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সামনে রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের ইসলামীকরণ, সামরিকীকরণ, জুম্মদের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণ ও গণহত্যার প্রতিবাদ জানান। অপরদিকে ২ অক্টোবর জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্যোগে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয় এবং বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়। এছাড়া 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিজিনাস পিপলস অব সিএইচটি' গত ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। সংগঠনের সভাপতি ড. আদিত্য দেওয়ানের স্বাক্ষরিত উক্ত স্মারকলিপিতে নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, ১৯৭০ সাল থেকে বসতিকারী সেটেলার বাঙালিদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া ইত্যাদি দাবি করা হয়।

সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল

কাপ্তাইয়ে চা বাগানের নামে ৫০০ আদিবাসী জুম্ম পরিবারের ১৫০০ একর জমি জবরদখল

রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্‌গা ইউনিয়নের ওয়াগ্‌গা মৌজার নোয়াপাড়া, দোলন্যা, নুনছড়ি ও বড়ইছড়ি– এই ৪টি গ্রামে ৫০০ আদিবাসী জুম্ম পরিবারের ভোগ দখলকৃত আনুমানিক ১৫০০ (দেড় হাজার) একর সমতল এবং পাহাড় জমি ওয়াগ্‌গা চা বাগানের মালিক খোরশেদুল আলম কাদেরী ও ম্যানেজার আমিনূর রশিদ কাদেরী ইতিমধ্যে বেদখল করে নিয়েছেন বলে জানা যায়। তাছাড়া এ দুইজন ভূমি পিপাসু আরও অধিকতর জায়গা বেদখল করার পাঁয়তারা করছে বলে জানানো হয়ে থাকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, উল্লেখিত এলাকার ৫০০ আদিবাসী পরিবারের মধ্যে ২৫০০ জন লোক প্রায় ১০০ বছর ধরে বসবাস করে জমিগুলি ভোগ দখল করে আসছে। কিন্তু খোরশেদুল আলম কাদেরী ও আমিনুর রসিদ কাদেরীর ভূমি বেদখলের অব্যাহত কার্যক্রমের ফলে উক্ত আদিবাসী জুম্মদের বন্দোবস্তীকৃত ১৫০ একরসহ ভোগদখলীয় আনুমানিক ১৫০০ একর জমি হারিয়ে তারা নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হচ্ছে বলে জানা যায়। অপরদিকে ওয়াগ্‌গা চা বাগানের ম্যানেজার আমিনুর রশিদ কাদেরী-এর বয়ান মতে জানা যায় যে, বিগত ১৯৭৮ সালে ২৫ বছর মেয়াদী চা বাগান করার জন্য চিৎমরম ও ওয়াগ্‌গা এলাকায় খোরশেদুল আলম কাদেরী মোট ৭৬০.৯৯ একর জমি সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়েছে। তাই তারা বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতায় উক্ত জমিতে চা বাগান সৃজন করছে। কিন্তু এলাকাবাসীদের অভিযোগ সরকার হতে জমি লিজের নামে কর্ণফুলী নদীর ধারে শতাধিক একর জায়গার উপর চা বাগান সৃজন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তার পাশাপাশি প্রায় ১০০ বছর ধরে ভোগদখল করে আসা আনুমানিক ১৫০০ একরের উপর তাদের বেদখল এবং বেদখলকৃত জায়গার উপর তামাক চাষ করার ফলে পরিবেশ দূষণসহ তাদের বাড়িঘর তোলার জায়গা পর্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

লংগদু হতে রাঙামাটিগামী দু'টি দেশীয় টেম্পু বোটে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ডাকাতি, আহত ৩

গত ৯ জুলাই ২০১২ সকাল ৯ টায় রাঙামাটি লংগদু হতে রাঙামাটিগামী ফুরেরমুখ ও বৈদ্যটিলা নামকস্থানে ইঞ্জিন চালিত আদিবাসী জুম্মদের দু'টি দেশীয় টেম্পু বোটে হামলা চালিয়ে সেটেলার বাঙালিরা লুটপাট করেছে বলে জানা গেছে। এ হামলায় ৩ জন জুম্ম মারাত্মক আহত হয়েছে। আহতরা হলো- উৎপল কান্তি চাকমা (৩৭) পিতা: নরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম: কিনা রামছড়া, বাঘাইছড়ি; রিকেন চাকমা (৩০) পিতা: সূর্য কুমার চাকমা, গ্রাম: শিজকমুখ, বাঘাইছড়ি এবং দ্রোনাচার্য চাকমা (৫০) পিতা: মৃত সুমতি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম: গলাচিপা,বাঘাইছড়ি। এসময় দু'টি বোটের ১১ জন জুম্ম যাত্রীদের কাছ থেকে ১১টি মোবাইল সেট, দেড় লক্ষ টাকা ও দেড় বড়ি স্বর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জানা যায়, ১০ জন সেটেলার বাঙালি বোট নিয়ে ডাকাতি করে। ঘটনার সময় উৎপল চাকমার মাথায় এবং রিকেন চাকমার হাতে কিরিচের কোপে মারাত্মক আহত হয়। আহতদের লংগদু উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাটিরাঙ্গায় পরিকল্পিতভাবে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা

গত ৪ আগস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক সোয়া আটটার সময় খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলার বরনাল মৌজা ও বরনাল ইউনিয়নের কদমতলী, ডাকবাংলো, তবলছড়ি, তাইন্দ্যং ইত্যাদি এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানোর চেষ্টা করা হয়।

জানা যায়, ঘটনার সময় তাইন্দ্যং এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা দুইজন সেটেলার বাঙালি যুবক তাদের বর্ণনানুযায়ী মাটিরাঙ্গা সদরে সোনা বিক্রয় করতে চলে আসে। তারা সোনা বিক্রি করে ফেরার সময় বরনাল মৌজা ও বরনাল ইউনিয়নের মংজাই কার্বারী পাড়ার লালমিয়া বাগান এলাকায় রাত আনুমানিক সোয়া আটটার সময় পৌঁছলে সে এলাকার এক পুলের উপরে চাকমাভাষা-ভাষী ৩/৪ জন লোক তাদেরকে পথরোধ করে ও তাদের মারধোর করে এবং বিক্রিত সোনার ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে ডাকবাংলো বাজারের ঔষধ বিক্রেতা শাহ আলমের দোকানে এসে প্রকাশ করে। দুইজনের মধ্যে একজনের পায়ের আঙ্গুলে পাথরের আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত। অপরজন দোকানে এসে আঘাতপ্রাপ্ত মুমূর্ষু রোগী সাজে। তাদের এ সাজানো নাটকটির কথা ঔষধ বিক্রেতা জনাব শাহ আলম প্রকাশ করেন। সে বিষয়টা আশপাশের সেটেলার বাঙালি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লে বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আনুমানিক ৩০/৪০টা মোটর সাইকেল ও দুইটি জীপ (চাঁদের গাড়ি) গাড়ি যোগে কমপক্ষে ১২০ হতে ১৫০ জন সেটেলার বাঙালি কদমতলী পাহাড়ি গ্রামে আক্রমণ করতে চলে আসে। সে সময় সেটেলার বাঙালিরা কদমতলী গ্রামের বাসিন্দা সুনীল চাকমা (৬০) পিতা- মৃত থুরুঙ্যা চাকমার বাড়িতে পৌঁছলে সেখানে দা হাতে দু'জন চাকমা যুবককে দেখতে পেয়ে তাদেরকে টাকা ছিনতাইকারী আখ্যায়িত করে। উক্ত দুজন যুবক হচ্ছে-(১) পুতুল্যা চাকমা (২৮) পিতা- জাপানী মোহন চাকমা, গ্রাম- কদমতলী, (২) পান্থমুনি চাকমা (২৫) পিতা- আমেরিকা চাকমা, গ্রাম- কদমতলী।

পরে ঘটনাস্থলে বরনাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: আলী আকবর উপস্থিত হন। তিনি ঐ দুই চাকমা যুবককে ছাড়িয়ে নিয়ে সুনীল চাকমার বাড়িতে ঢুকিয়ে দেন। তবুও সুনীল চাকমার বাড়িতে

সেটেলার বাঙালিরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বাঙালিদের ফিরিয়ে দিলে সেটেলাররা ডাকবাংলো বাজার এলাকার দিকে গিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু সেদিকে বৌদ্ধ মন্দিরের উপর হামলা চালানোর সময় যামিনী পাড়া বিজিবি জোন হতে জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল মো: তাবিদ এর নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সেটেলার বাঙালিরা পিছু হটে। সেটেলার বাঙালিদের এরকম উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা দেখে কদমতলী, তবলছড়ি মাষ্টার পাড়া, তাইন্দ্যং ইত্যাদি এলাকার জুম্মরা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাত প্রায় ১০টার সময় বিএসএফ এর সহযোগিতায় ১৬৫ জন জুম্ম ভারতে আশ্রয় নেন। পরদিন ৫ আগস্ট ২০১২ রোজ রবিবার সকাল ৭:৩০ টায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর ভারতে আশ্রিত ১৬৫ জন জুম্মকে বিজিবি কর্তৃপক্ষ তবলছড়ি বিওপির কম্যান্ডার সুবেদার মোহাম্মদ আলীর কাছ হস্তান্তর করে।

তারপরে যামিনীপাড়া বিজিবি জোন অধিনায়ক লে: কর্ণেল মোহাম্মদ তাবিদের আহ্বানে পাহাড়ি বাঙালি মুরুব্বীদের নিয়ে তবলছড়ি পিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বরনাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ ঘটনায় ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পরবর্তীতে এরকম কোন ঘটনা শুরু হলে প্রথমে পাহাড়ি-বাঙালি উভয়ের একালার মুরুব্বীদের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো দরকার। খাগড়াছড়ির এমপি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ৫ আগস্ট ২০১২ দুপুর ২.৩০ টার সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পানছড়িতে সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা তিনজন জুম্ম গ্রামবাসী আক্রান্ত

গত ২৬ আগস্ট ২০১২ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার উত্তর শান্তিপুর গ্রামে একজন মহিলাসহ তিন জন জুম্ম আক্রান্ত হয়। তাদের মধ্যে দুইজনকে প্রথমে পানছড়ি সরকারি হাসপাতালে পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খাগড়াছড়ি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

জানা যায় যে, সেদিন পানছড়ি উপজেলার উত্তর শান্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা কান্তি ভূষণ চাকমা (৭০) পীং গিরিশ চন্দ্র চাকমা এর রেকর্ডকৃত জায়গায় পানছড়ি উপজেলাধীন উল্টাছড়ি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের অমরপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদ রানা (৩০) পীং সাদেক আলীর নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিরা বাড়ি নির্মাণ শুরু করে। এই খবর পেয়ে কান্তি ভূষণ চাকমা তার জায়গায় বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ এবং সেটেলার বাঙালিদেরকে বাড়ি নির্মাণ থেকে বিরত করার জন্য পানছড়ি থানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

তাই কান্তিভূষণ চাকমা, তার স্ত্রী লক্ষ্মী সীতা চাকমা (৬৫) এবং তার পুত্র ত্রিরতন চাকমা (৩৫) সেদিন অপরাহ্ন ৩:০০টার দিকে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। তাদের জায়গায় সেটেলার বাঙালিদেরকে বাড়ি নির্মাণ করতে বাঁধা দিতে গেলে সেটেলার বাঙালিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কান্তি ভূষণ চাকমার ডান হাতের তিনটা আঙ্গুল কাটা যায়। তখন লক্ষ্মী সীতা চাকমার বৃদ্ধাঙ্গুলও কাটা যায়। ত্রিরতন চাকমার বাম বাহু এবং বাম হাতও কাটা যায়। তাদের সবাইকে পানছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লক্ষ্মী সীতা চাকমাকে উপজেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে কান্তি ভূষণ চাকমা ও ত্রিরতন চাকমাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খাগড়াছড়ি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত কোন অপরাধীকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি।

সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জমি জবরদখলের প্রচেষ্টা

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিকাল ৩:০০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভূয়াছড়ি মৌজাস্থ বেতছড়ির বরনাল গ্রামের বাসিন্দা (১) জীবিত লাল চাকমা, বয়স- আনুমানিক ৬০ বৎসর, পিতা- মৃত হরি কিশোর চাকমা, (২) অমৃত লাল চাকমা, বয়স- আনুমানিক ৬৩ বৎসর, পিতা- মৃত হরি কিশোর চাকমা দু'ভাইয়ের রেকর্ডীয় ও দখলীয় মোট ১১.০০ (এগার) একর এবং একই গ্রামে (৩) ইন্দ্র মোহন চাকমা, পিতা- মৃত যোগেন্দ্র চাকমা এর ৫.০০ (পাঁচ) একর জমির উপর ৪০/৫০ জন সেটেলার বাঙালি অবৈধভাবে বাড়িঘর তুলতে আরম্ভ করে। স্থানীয় পাহাড়িদের কাছে এ ঘটনা জানাজানি হলে পাহাড়িরাও দলবদ্ধভাবে গিয়ে বাঙালিদের বাধা প্রদান করে থাকে। এরপর দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। তবে এ ঘটনায় কোন ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে বলে জানা যায়নি। শেষে উপজেলা সদর থেকে আর্মী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তারা উভয় পক্ষকে জানিয়ে দেয় যে, বিতর্কিত ঐ জমিতে কোন পক্ষই যেন আর হাত না দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাধা অমান্য করে পরের দিন ১৭ সেপ্টেম্বর বাঙালিরা আরো জঙ্গল কাটতে যায় এবং আর্মীরা তাদেরকে আবারও তাড়িয়ে দেয়।

বাঙালি ছাত্র পরিষদের আক্রমণে একজন জুম্ম আহত

উক্ত ভূমি দখল করতে না পারার প্রতিবাদে ১৭ সেপ্টেম্বর বাঙালি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি সদরে এক মিছিল বের করে। উক্ত মিছিল শেষে বাঙালি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা খাগড়াছড়ি জেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের বেতছড়ি এলাকার বাসিন্দা খোকন চাকমা (২৬) পিতা- নীল রঞ্জন চাকমা এবং রত্নাকর চাকমা (৩২) পিতা- সুরেশ্বর চাকমা নামে দুই পাহাড়ি যুবককে ধরে মারপিট করে মারাত্মক আহত করে। পরে উক্ত দুই পাহাড়ি ছেলেকে আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ রত্নাকর চাকমা বাদী হয়ে নিম্নেলিখিত সেটেলার বাঙালিদের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি সদর থানায় একটা মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত সেটেলার বাঙালিরা হলো– ১. মোহাম্মদ জাকির হোসেন (২০) পিতা আব্দুল হামিদ, গ্রাম- ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি মৌজা; ২. কাওসার আলী (২১) পিতা- আনসার আলী, গ্রাম- ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি মৌজা; ৩. মোহাম্মদ রব্বানী (২২), গ্রাম- ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি মৌজা; ৪. মোহাম্মদ হযরত (২০), গ্রাম- ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি মৌজা; ৫. আব্দুল মজিদ (২৫), আহবায়ক, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ, ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি মৌজা; ৬. মোহাম্মদ মোস্তফা (৩০) গ্রাম- ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি

মৌজা; ৭. মাইনুদ্দিন ভূইঁয়া (২২) পিতা- শাহ জালাল ভূইঁয়া, গ্রাম-ভূয়াছড়ি, ভূয়াছড়ি মৌজা; ৮. সুব্রত নন্দ দাশ (৩৩) পিতা আনন্দ মোহন দাশ, গ্রাম রাজ্যমণি পাড়া, গোলাবাদী মৌজা; ৯. আনন্দ মোহন দাশ (৫৫), গ্রাম রাজ্যমণি পাড়া, গোলাবাদী মৌজা।

মাটিরাঙায় জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের সম্প্রদায়িক হামলা, একটি মন্দিরসহ ১৫টির অধিক বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট

গত ১৫ অক্টোবর ২০১২ রাত সাড়ে ১০ টায় মাটিরাঙা উপজেলার তবলছড়ির তৈলাইফাং মৌজার বর্ণাল ইউপি'র রাজদর পাড়া ত্রিপুরা গ্রামে সেটেলার বাঙালিরা হামলা চালিয়ে একটি শিব মন্দিরসহ জুম্মদের বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে।

জানা যায়, তবলছড়ির ১৮১ নং তৈলাইফাং মৌজার ৩নং বর্ণাল ইউপি'র ডাকবাংলা বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে। দীর্ঘদিন পরও চাঁদা পরিশোধ না করায় ইউপিডিএফ-এর চিফ কালেক্টার জেরিন চাকমার নেতৃত্বে ৪ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ডাকবাংলা বাজারে রওয়ানা দেয়। এ সময় বাজার থেকে ফেরার পথে মো: মোস্তফা ও তার ছেলেকে আটক করে। পরে ছেলেকে ছেড়ে দিলেও মো: মোস্তফাকে আটক করে রাখে। মো: মোস্তফার ছেলে ডাকবাংলা বাজারে এসে বাঙালিদের এ ঘটনা সম্পর্কে জানালে তারা উত্তেজিত হয়। পরে ৩নং বর্ণাল ইউপি চেয়ারম্যান আলী আকবর (৬০) ও সাবেক ইউপি মেম্বার আলাউদ্দিন ওরফে বাবুল, পিতা: মৃত-ওসমান গনি- এর নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন সেটেলার বাঙালি লাঠিসোটা ও দা-কিরিচ নিয়ে রাজদর ত্রিপুরা গ্রামে হামলা চালিয়ে একটি শিব মন্দিরসহ ১৫ টি অধিক বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ খবর পেয়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মো: মোস্তফাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। শিব মন্দিরে হামলার সময় মন্দিরের পাশের বাড়ি থেকে পুরহিত ললি মোহন ত্রিপুরা, পিতা: হরি চরণ ত্রিপুরা পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। এ সময়ে সেখানে বসবাসরত একমাত্র বড়ুয়া পরিবার বিমল চন্দ্র বড়ুয়ার ছেলে প্রীতি বিন্দু বড়ুয়ার দোকানটিও সম্পূর্ণ ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। এ হামলার পর সেটেলার বাঙালিরা আবার প্রায় ২ কি:মি: দূরে বড়পাড়া গ্রামে হামলা চালাতে গেলে পথে যামিনীপাড়া বিজিবি জোনের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড মেজর কামরুলের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সেটেলার বাঙালিদের বাধা দেয়। ঘটনার সময় রাজদর পাড়া ও বড়পাড়া গ্রামের ত্রিপুরা গ্রামবাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সাবেক বর্ণাল ইউপি মেম্বার আওয়ামীলীগ নেতা ধনমিয়া, পিতা: ছিদ্দিক মিয়া ১৯৮১ ও ১৯৮৬ সালের গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটবে বলে জুম্মদের হুমকি দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

মাটিরাঙ্গায় ত্রিপুরাদের দুর্গামন্দিরে সেটেলার বাঙালিদের হামলা

গত ২১ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.০০ টার দিকে তবলছড়ি সেটেলার বাঙালি পাড়ার আবুল কাশেম (৩৫) পিতা বুলবুল আহম্মেদ এর নেতৃত্বে ৫ জন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার আদিবাসী ত্রিপুরা অধ্যুষিত লাইশ্রাপাড়ায় (রামবাবু ঢেবা) হামলা চালিয়ে ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের দুর্গামন্দির তছনছ করে এবং মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে। এ সময় মন্দিরে ডিউটিরত পুলিশ হামলাকারী সেটেলার বাঙালিদের ছত্রভঙ্গ করে।

জমি দখল করার উদ্দেশ্যে এক জুম্ম পরিবারের উপর বাঙালিদের হামলা, আহত ৪ জুম্ম

গত ২ নভেম্বর ২০১২ রাত ১১.০০ ঘটিকার দিকে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন বাঙালি লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ফাত্রাঝিরি গর্জনবনিয়া গ্রামের কমল কান্তি চাকমার পরিবারের উপর হামলা করে। হামলায় কমল কান্তি চাকমাসহ (তঞ্চ্যাঙ্গ) পরিবারের ৪ জন জখম হয়। আহতদের মধ্যে কমলকান্তি চাকমার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ধারালো দা'য়ের কোপে তার মাথায় ও হাতে গুরুতর জখম হয়েছে। আহতদের কক্সবাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায় যে, অনেকদিন আগে কমল কান্তি চাকমা কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং ভালুকিয়া গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ আলী পিতা তৈইয়ম গোলালের নিকট কিছু জমি বিক্রি করেন। কিন্তু মোহাম্মদ আলী যে পরিমাণ জমি কিনেছে তার তিনগুণ জমি দাবি করেন এবং ঘুষের বিনিময়ে জাল দলিলও তৈরি করেন। এ প্রেক্ষিতে কমল কান্তি চাকমা বান্দরবান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে নামজারি বাতিল, ভূয়া দলিল তৈরিকরণ ও পাহাড় কেটে জবরদখলের অভিযোগে তিনটি মামলা দায়ের করেন। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ আলীও কমল কান্তি চাকমার বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করেন।

কিন্তু মোহাম্মদ আলী আইন-আদালতের কোন কিছু তোয়াক্কা না করে কমল কান্তি চাকমার জায়গা-জমি জোরপূর্বক দখল করার লক্ষ্যে ঐদিন রাতে দলবল নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলো– কমল কান্তি চাকমা (৫০) পিতা অংহ্লা থুই চাকমা, চিং চা হ্লা চাকমা (২৫) পিতা কমল কান্তি চাকমা, জায়মা উ চাকমা (৫৫) স্বামী সুইথু অং চাকমা ও রাজা অং চাকমা (২৫) পিতা সুইথু অং চাকমা। হামলায় বাঙালিরা কমল কান্তি তঞ্চঙ্গা ও প্রতিবেশী আরেকজনের বাড়ীসহ দু'টি বাড়ি ভাঙচুর করে। স্থানীয় ফাত্রাঝিরি বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা হামলাকারী ১২ জন বাঙালিকে গ্রেফতার করেছে। তাদেরকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

রাঙামাটিতে চিকিৎসার জন্য এসে এক জুম্ম নারী হত্যার শিকার

গত ৭ জুলাই ২০১২ রাঙামাটির বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের সুগরিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বলি মিলা চাকমা (৪২) স্বামী: দূর্গা মনি চাকমা রাঙামাটি সদরের উলুছড়িতে খুন হয়েছে। তিনি অসুস্থ অবস্থায় গত ৫ জুলাই ২০১২ চিকিৎসা নিতে এসে রাঙামাটি সদরের ভেদভেদীস্থ উলুছড়িতে তার জ্যাঠা রজনী চাকমা ওরফে সারা বাপের (৭০) বাড়িতে উঠেছিল। জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুর ২ টার দিকে পানি আনার জন্য বাড়ির পার্শ্ববর্তী ছড়ায় যায়। সেখানে তাকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ধারণা হচ্ছে তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। বাড়িতে ফিরে না আসায় বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজা-খুঁজির পর ছড়ায় বলি মিলা চাকমার লাশ বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মাথার পেছনের ঘাড়ে ও ডান হাতে কাটা রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ সেটেলার বাঙালিরা তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে।

পুলিশ বিকাল ৪টায় ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে সন্ধ্যা ৭টায় ময়নাতদন্তের জন্য রাঙামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। এ ঘটনায় নিহতের জ্যাঠা রজনী চাকমা কোতোয়ালী থানায় ভেদভেদীর আনসার ক্যাম্প এলাকার অধিবাসী সোহেল (২৬) পিতা আবদুল লতিফ, মো. সোহেল (২৫) পিতা ফেরদৌসী বেগম ও মানাইয়া (২৬) পিতা বাদশা মিয়ার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। গত ৯ জুলাই সোহেল (২৬) পিতা আবদুল লতিফকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

খাগড়াছড়িতে ১১ বছরের এক আদিবাসী নারী শিশু পুলিশ সদস্য কর্তৃক ধর্ষিত

খাগড়াছড়ি জেলা'র দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের ৯ মাইল এলাকার তপন কার্বারী ত্রিপুরা পাড়ায় ১১ বছরের এক ত্রিপুরা নারী শিশু অটলটিলা পুলিশ ক্যাম্পের কনস্টেবল রাসেল রানা কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। গত ২১ আগস্ট ২০১২ বিকাল ২:৩০টায় ওই ক্যাম্প সংলগ্ন এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ওই ধর্ষক পুলিশ কনস্টেবল রাসেল রানা (২১) (কং নং-২১৮০) পঞ্চগড় জেলা সদরের বাঁশবাড়ি গ্রামের মো: আবদুল আলিমের ছেলে বলে জানা যায়।

জানা যায়, ওই শিশু ও তার ৮ বছরের ছোট বোনসহ দুপুর প্রায় ১২ টার দিকে অটলটিলার পুলিশ ক্যাম্পের কাছে গরু চড়াতে যায়। এক পর্যায়ে ছোট বোনকে রেখে কিছু দূরে তরকারি আনতে গেলে ওৎপেতে থাকা পুলিশ কনস্টেবল রাসেল রানা শিশুটিকে ধরে মুখে গামছা বেঁধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে ছোট বোনটি তার বোনকে খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে এসে তার মাকে জানায়। অনেক খোঁজাখুজির পর শিশুটির মা তার মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। ধর্ষিত শিশুটির মা পুলিশক্যাম্পে গিয়ে দায়িত্বরত মো: শাহ আলমকে ঘটনা সম্পর্কে জানিয়ে বিচারের দাবি করে। কিন্তু মো: শাহ আলম ধর্ষিতার মাকে এক হাজার টাকা দিয়ে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে চলে আসে। ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ বাধ্য হয়ে ওই ধর্ষক পুলিশ কনস্টেবল রাসেল রানাকে আটক করে। ধর্ষণের ঘটনায় ওই শিশুটির মা নিত্যবালা ত্রিপুরা ওই দিন রাতে দীঘিনালা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)এর ৯(১) ধারায় মামলা (মামলা নং-৩ তারিখ: ২১/০৮/২০১২) দায়ের করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালিদের হামলায় একজন বৃদ্ধ জুম্ম নারী নিহত

গত ২২ আগস্ট ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দয় মৌজার সুধিনা রঞ্জন হেডম্যান পাড়ার বাসিন্দা ফুল কুমারী ত্রিপুরা নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে হত্যা করা হয়। জানা যায়, সেদিন উক্ত বৃদ্ধা পাশের ছড়ায় মাছ ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বাড়িতে আসতে দেরি হওয়ায় আত্মীয়রা খোঁজ নিতে যায় এবং সেটেলার বাঙালি বসতির সন্নিকটস্থ ছড়ায় উক্ত বৃদ্ধাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। গ্রামবাসীদের ধারণা, উক্ত বৃদ্ধাকে সেটেলার বাঙালিরা হত্যা করেছে। বৃদ্ধার শরীরে গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তী হয়রানির ভয়ে মৃতের আত্মীয়রা কোন মামলা না করে মৃতের দাহ করে বলে জানা যায়।

কাপ্তাই উপজেলায় সেনা সদস্য কর্তৃক এক আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার বড়ইছড়ি কর্ণফুলী কলেজ গেইট সংলগ্ন এলাকায় গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ১:৩০ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক বাড়ির দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এক মারমা আদিবাসী ছাত্রীকে জোর পূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

জানা যায়, মো: আবু ইউসুফ ওরফে বাবু (২০) পিতা: মো: ইব্রাহিম মজুমদার একজন সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে

খাগড়াছড়িতে কর্মরত। বিলাইছড়ি উপজেলার তক্তানালা গ্রামের মিংসাহ্লা মারমার মেয়ে কর্ণফূলী ডিগ্রী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মো: ইসমাইলের বাড়িতে ভাড়া থাকতো। ঘটনার সময় সেনা সদস্য মো: আবু ইউসুফ ওরফে বাবু রাতে ওই ছাত্রীর ঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে ধর্ষণ ও অন্যত্র তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। পরে ছাত্রীটির চিৎকারে অন্যকক্ষে থাকা সহপাঠী ও পার্শ্ববর্তী লোকজন এগিয়ে আসলে সেনা সদস্য মো: আবু ইউসুফ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পর দিন সকালে উক্ত ছাত্রী তার সহপাঠীদের সহযোগিতায় সেনা সদস্য মো: আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে (মামলা নং ১, তাং ০৯/০৯/২০১২ ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ (সংশোধিত/০৩) এর ৯(৪)(খ) ধারা) মামলা করে। জানা গেছে, কাপ্তাই থানা পুলিশ অভিযুক্ত ওই সেনা সদস্যকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ গ্রেফতার করলেও সন্ধ্যার দিকে কাপ্তাই জোনের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা অভিযুক্ত ওই সেনা সদস্যকে থানা থেকে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

দীঘিনালায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের নালকাটা নামক গ্রামের ২৫ বছর বয়সী বিবাহিত এক জুম্ম নারী পার্শ্ববর্তী গ্রামের মো: আজহার (২৫) নামের জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুর ২:০০ টার দিকে ঐ জুম্ম নারী বাড়ির অনতিদূরে এক টিলায় গরু আনতে গেলে মো: আজহার, পিতা- মোঃ গফুর আলী পিসি, গ্রাম- উত্তর মিলনপুর, ইউনিয়ন- কবাখালী নামে সেটেলার বাঙালিটি হঠাৎ পেছন থেকে জোরপূর্বক ঝাপটে ধরে এবং ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর ধর্ষক অজ্ঞান অবস্থায় ঐ নারীকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে ধর্ষিতার স্বামী ঐ নারীকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্নসহ অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পায়। এরপর ঐ নারীকে প্রথমে দীঘিনালা উপজেলা হাসপাতালে ও পরে খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ বিষয়ে দীঘিনালা থানায় একটি মামলা হয়। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। পক্ষান্তরে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত মো: আজহারকে পাহাড়িরা গুম করেছে এমন মিথ্যা অভিযোগ করে সেটেলার বাঙালিরা দীঘিনালায় মিছিল করেছে।

রাজস্থলীতে এক তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

গত ২ অক্টোবর ২০১২ এক ১৪ বছরের তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রী কিশোরী এক সেটেলার বাঙালি ছাত্রের ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। জানা যায় যে, সেদিন সকাল আনুমানিক ৭:০০ টায় গাইন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর উক্ত ছাত্রীটি স্কুলের শিক্ষক মংখ্যথুই মারমার নিকট প্রাইভেট পড়ার জন্য স্কুলের উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা দেয়। সকাল আনুমানিক ৭:৪০ টায় স্কুলের সন্নিকটে পৌঁছলে হঠাৎ পেটে ব্যাথা শুরু হলে প্রাইভেট কক্ষে না গিয়ে সে নিজের শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে বিশ্রাম নিতে থাকে এবং সেখানে বসেই সকাল ১০:০০ টার স্কুলের ক্লাশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

সকাল ৯:৩০ টার দিকে একই স্কুলের ছাত্র মো: আরিফুল ইসলাম (১৬) সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং কক্ষে তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রীকে একা পেয়ে কক্ষে প্রবেশ করে উক্ত ছাত্রীকে ঝাপটে ধরে। ছাত্রীটি তখন আরিফুলের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলে আরিফুল দুই হাত ধরে জোর করে স্কুলের দক্ষিণ দিকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এতে ছাত্রীটি যথাসাধ্য চেষ্টা করে আরিফুলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং পুনরায় শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে। এমন সময় একই ক্লাশের ছাত্র ও চাচাত ভাই মিলন তঞ্চঙ্গ্যা সেখানে এসে উপস্থিত হলে ছাত্রীটি তাকে ঘটনাটি জানায়। এরপর অন্যান্য ছাত্র ও উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে ঘটনাটি জানাজানি হতে থাকলে আরিফুল ইসলাম স্কুল থেকে পালিয়ে যায়।

ঐদিনই বিকাল আনুমানিক ৪:০০ টায় ছাত্রীটি তার বাবা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো: হোসেন বেলাল, সহকারী শিক্ষক সুইমংউ মারমার সহযোগিতায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী) ২০০৩ এর আওতায় রাজস্থলী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। রাজস্থলী থানার মামলা নং ০১, তারিখ- ০২/১০/১২ খ্রি:, ধারা ১০। পুলিশ এখনো আরিফুল ইসলামকে ধরতে পারেনি।

জনৈক সেনাসদস্য কর্তৃক জুম্ম ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার কিয়াংঘাট মৌজা ও কায়াংঘাট ইউনিয়নের কড়ল্যাছড়ি হেডম্যানপাড়া বাসিন্দা এক চাকমা আদিবাসী স্কুল ছাত্রীর কিয়াংঘাট সেনা ক্যাম্পের জনৈক সেনা সদস্য কর্তৃক শ্লীলতা হানীর ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গত ১৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টার সময় কড়ল্যাছড়ি গ্রামের (১) নন্দিতা চাকমা, ১০ম শ্রেণী, বয়স আনুমানিক ১৫ বৎসর, পিতা- স্বর্ণ কুমার চাকমা, গ্রাম- কড়ল্যাছড়ি হেডম্যান পাড়া, মহালছড়ি উপজেলা, জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, (২) বিদেশী চাকমা-সপ্তম শ্রেণী, বয়স- আনুমানিক ১৩ বৎসর, পিতা- আদি রতন চাকমা, সাং- ঐ ও (৩) লুচি চাকমা, ৬ষ্ট শ্রেণী, বয়স– আনুমানিক ১২ বৎসর, পিতা- দীন বন্ধু চাকমা, সাং- ঐ ৩ জন স্কুল ছাত্রী উল্টাছড়ি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। স্কুলে যাওয়ার আধপথে উল্টাছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে আনুমানিক ১৫০ গজ দূরত্বে জনশূণ্য স্থানে পৌঁছলে একজন সেনা সদস্য তাদের ৩ জনকে প্রথমে কে কোন ক্লাশে পড়ছে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পরে পিছু ধাওয়া করে। সেনা সদস্যটি ১ নং ছাত্রী নন্দিতা চাকমাকে কোমরে ধরে ফেলে। তবে টানাটানি করে পরে ছাড়া পায়।

স্কুলে পৌঁছার সাথে সাথে ছাত্রীরা এ সব ঘটনার বিবরণ স্কুলের সহকারী শিক্ষক প্রদীপ কুমার চাকমার নিকট খুলে বলে এবং বিকালে বাড়িতে পৌঁছার সাথে সাথে ছাত্রীরা নিজ নিজ অভিভাবকের নিকটও ঘটনাটি জানায়। কিন্তু শিক্ষক ও

অভিভাবকরা ২ দিন পর অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সকাল বেলায় সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানকে ঘটনাটির কথা অবগত করলে চেয়ারম্যান সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প কম্যান্ডারের নিকট বিষয়টি জানায়। ঐ দিনই ক্যাম্প কম্যান্ডার মেজর আজম ও লে: মশিউর দুজনে ঘটনার তদন্তে চলে আসেন। ঘটনাটি বড় ধরনের নয় বলে স্কুল শিক্ষক, ছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় মেম্বার-চেয়ারম্যানরা পরবর্তীতে যেন আর এ রকম ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে ক্যাম্প কম্যান্ডারদের নিকট অনুরোধ রাখেন।

রোয়াংছড়িতে এক আদিবাসী বোবা নারী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

গত ৩ অক্টোবর ২০১২ রাতে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি ইউনিয়নের কাইথারমুখ পাড়ায় রাস্তা নির্মাণকারী শ্রমিক মো: ইলিয়াস নামের এক দুর্বৃত্ত পাড়ার এক বোবা মারমা মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টার করার সময় পাড়াবাসী ধরে ফেলে। তাকে পাড়াবাসী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সাহামং মারমা-এর নিকট সোপর্দ করে। মেয়েটির আত্মীয় বা পাড়াবাসী আর্থিক কারণ ও আদালতের বিচারে হয়রানী হওয়ার ভয়ে কোন মামলা করেনি। পরে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় ৪০ হাজার টাকার রফদফা হয় বলে জানা যায়।

বাঙালি সেটেলার কর্তৃক একজন জুম্ম কলেজ ছাত্রীকে ফুসলিয়ে পলায়ন

গত ২৪ অক্টোবর ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা থানাধীন বাল্যাছড়ি গ্রামের এক ১৭ বছরের কলেজে পড়ুয়া ত্রিপুরা মেয়েকে ঐ গ্রামের এক সেটেলার বাঙালি ফুসলিয়ে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েটির অভিভাবকরা থানায় মামলা করতে গেলে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় গুইমারা জোনের উপ-অধিনায়ক বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, ঐদিন ঐ ত্রিপুরা মেয়েকে একই পাড়ার বাসিন্দা মো: এরশাদ পিতা শফি (প্রাক্তন মেম্বার) বেড়াতে যাবার অজুহাত দেখিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টা গ্রামবাসীদের মধ্যে জানাজানি হলে গ্রামের মুরুব্বীদের নিয়ে মেয়েটির বাবা কিরচন্দ্র ধামাই ২৫ অক্টোবর ২০১২ গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বশীর আহম্মদকে অবগত করানোর পর মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। এসময় গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও গুইমারা জোনের জনৈক মেজর তানভীর মেয়েটির অভিভাবকদের মামলা না করার জন্য চাপ দেন এই বলে যে, তারা বিষয়টা দেখবেন।

সেদিন ২৪ অক্টোবর থানার ওসি মেয়েটির অভিভাবকদের মামলা গ্রহণ করেননি। পরে মনগড়াভাবে ২৮ অক্টোবর ২০১২ ওসি মামলা গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত মামলা দায়েরের সময় এরশাদের পিতাকে ২ নম্বর আসামী করে মামলা দায়ের করতে চাইলে ওসি উক্ত মামলা গ্রহণ করেননি। পরে শফি মেম্বারের নাম আসামী তালিকা থেকে বাদ দিয়ে মামলা দায়ের করতে হয়েছিল। কিন্তু মামলা করা হলেও পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করা বা ত্রিপুরা মেয়েটিকে উদ্ধারের ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

চট্টগ্রামে এক জুম্ম ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার

গত ২৮ অক্টোবর ২০১২ চট্টগ্রাম মহানগরীর খুলশী থানার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এলাকায় দশম শ্রেণী পড়ুয়া ১৪ বছরের এক চাকমা ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা যায়, রোববার রাত ৮:০০ টার দিকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সংলগ্ন পাহাড়ে ওই কিশোরী ও পিয়াস চাকমা নামে আরেকজন চাকমা ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গেলে এ ঘটনার শিকার হয়। এ সময় উক্ত চাকমা ছেলেসহ ওৎপেতে থাকা ৭/৮ জন বাঙালি ছাত্র ওই কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে বলে জানা গেছে।

পরে রাত ১০টার দিকে পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করে। ওই ঘটনার পর সোমবার দিনভর নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ধর্ষণে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ স্কুলছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো পিয়াস চাকমা, খালেদ শামস, আহাম্মেদ ফজল শাওন, সালমন জামান জয় ও ফাহাদ উদ্দিন পিউল। আরো জানা যায় যে, ধর্ষণকারীরা সকলেই একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র।

রামগড়ে এক বাঙালি সেটেলার কর্তৃক এক আদিবাসী মেয়ে ধর্ষিত

গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলার পাতাছড়ি ইউনিয়নের থলিপাড়া নিবাসী আনুমানিক ১৩ বছরের জনৈক ত্রিপুরা কিশোরী একই গ্রামের সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হয় বলে জানা গেছে। জানা যায় যে, সেদিন আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.০০ টায় থলিপাড়ার নিবাসী মো: রুবেল পিতা গিয়াস কামাল একই গ্রামের ঐ ত্রিপুরা কিশোরী মেয়েটিকে বাড়িতে একা পেয়ে বাড়ির অনতিদূরে ইউনিসেফের স্কুলের পার্শ্বে জঙ্গলে মুখে চেপে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে। বাড়িতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজির পর উক্ত স্থান থেকে মেয়েকে অজ্ঞান অবস্থায় গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। মেয়েটির বাবা দীন কুমার ত্রিপুরা একজন নিরীহ গরীব লোক। সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও আর্থিক হয়রানির ভয়ে মেয়েটির পিতা থানায় কোন মামলা করেননি।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন

বান্দরবানে 'বিজিবি কর্তৃক থানছি উপজেলা সদরে আদিবাসী বসতি জায়গায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে' সংবাদ সম্মেলন

গত ২ আগস্ট ২০১২ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বান্দরবান প্রেসক্লাবের প্রেস কনফারেন্স কক্ষে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক থানচি উপজেলা সদরের আদিবাসী বসতি জায়গায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে' সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বান্দরবান জেলা শাখার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও থানচি ভূমি সংরক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হ্লাফুসু মারমা (সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, থানিচি), সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কেএস মং মারমা, থানছি উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা শাখা বিএনপি সভাপতি খামলাই ম্রো, বান্দরবান জেলা পরিষদের সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা অংপ্রু ম্রো, থানছি আওয়ামী লীগ সভাপতি মং থোয়াই ম্যা মারমা, জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক সহ-সম্পাদক মংশৈম্রই মারমা, বিএনপি নেতা সাক্যচিং মারমা, ক্যহ্লাচিং মারমা, থানচি ইউপি চেয়ারম্যান মাংসার ম্রো, রেমাক্রী ইউপি চেয়ারম্যান মালিরাম ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি থানচি থানা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক চসাথোয়াই মারমা ও মেইমং মারমা। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন কেএস মং মারমা এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আহ্বায়ক হ্লাফুসু মারমা।

বিজিবি ক্যাম্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বন্ধ ও বাতিলের দাবিতে থানচি উপজেলা ভূমি অধিকার সংরক্ষণ কমিটির স্মারকলিপি

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন থানচি উপজেলা সদরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের নামে নতুনভাবে আদিবাসীদের বন্দোবস্তিকৃত আবাদী জমি, ফলমূলের বাগান ও বসতবাড়ি জায়গায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে এলাকার জনপ্রতিনিধিরা ২ আগস্ট ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, এই নতুন ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে থানচি উপজেলাবাসী মনে করে যে, ইহা কৌশলে পাহাড়ি আদিবাসীদেরকে চাষাবাদ যোগ্য জমি থেকে উচ্ছেদ করা এবং ভূমি হরণ করার একটি প্রক্রিয়া। থানচি উপজেলায় আপাত দৃষ্টিতে বিশাল পরিমাণ ভূমি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলেও মাত্রাতিরিক্ত খাড়া পাহাড়ভূমি বৈশিষ্ট্যের কারণে বসবাস ও আবাদীযোগ্য ভূমি অত্যন্ত কম। এর ফলে জনসংখ্যা অনুপাতে এখানে অত্যন্ত ভূমি সংকট রয়েছে। এছাড়া এখানে একদিকে সাধারণ জনগণের বংশ পরম্পরায় বাস্তুভিটা, জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে নানান জাতের ফলজ-বনজ বাগান; অন্যদিকে ৩নং থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ভবন, খাদ্য গুদাম, বিভিন্ন এনজিও অফিস, দীর্ঘ বছরের পরিশ্রমে গড়ে তোলা জনসাধারণের বসতঘর ও জমি স্থিত রয়েছে।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয় যে, উপরোল্লেখিত স্থানটিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে বসবাসরত পাহড়ী আদিবাসীগণ অন্যত্র বাসযোগ্য আর কোন ভূমি না থাকায় তাঁরা ভূমিহীন নিঃস্ব হয়ে যাবে। এর ফলে এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক, উত্তেজনা ও ব্যাপক হতাশা সৃষ্টি হয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং শান্তি-উন্নয়ন ব্যাহত হবে। উক্ত স্মারকলিপিতে থানচি উপজেলা সদরে বিজিবি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ ও বাতিল করা এবং আদিবাসীদের নিজ ভূমি হতে উচ্ছেদ হওয়া থেকে রক্ষা করার দাবি জানানো হয়।

বনরক্ষীদের গুলিতে একজন নিরীহ জুমচাষী নিহত

গত ১৯ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই ইউনিয়নের বনবিভাগের রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার শালবন জুম এলাকা নামক স্থানে গৃহস্থালি কাজের ব্যবহারের জন্য একটি ভেঙে পড়া জারুল গাছ কাটার সময় প্রিয়লাল তঞ্চঙ্গ্যা পালক্যা (৩৫) পীং বিষক ধন তঞ্চঙ্গ্যা নামের এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী স্থানীয় বনবিভাগের মুখবিট এর বিট কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর এর নেতৃত্বে একদল বনপ্রহরীর গুলিতে নিহত হয়। নিহতের মাথার বাম পার্শ্বে রক্তাক্ত জখম এবং পেটে ও বুকের বাম পার্শ্বে একাধিক গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়। নিহত প্রিয়লাল তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি ঐ শালবন এলাকারই পার্শ্ববর্তী ভাঙামুড়া নামক গ্রামে। জানা যায়, বিকাল আনুমানিক ৫:১৫ টায় কাপ্তাই পুলিশ ফাঁড়ির একদল পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। উল্লেখ্য যে, ঐ শালবন জুম এলাকাটি রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত হলেও তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত এবং এলাকাবাসী এ পর্যন্ত সেখানে জুম চাষ করে বলে জানা যায়। ২০ অক্টোবর ২০১২ নিহত জুমচাষীর শ্যালক জীবক তঞ্চঙ্গ্যা অজ্ঞাতনামা বনপ্রহরীর বিরুদ্ধে কাপ্তাই থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে এই কাপ্তাই এলাকার বনবিভাগের কর্মকর্তা ও বনপ্রহরীদের গুলিতে ও আক্রমণে প্রায়ই নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে হত্যা ও গুমের ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার কোনটিরই ন্যায়বিচার সম্ভব হচ্ছে না। যা এলাকায় অব্যাহতভাবে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে।

সুবলঙে সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফ কর্তৃক এক হাবাগোবা ব্যক্তিকে আটকের পর অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী বলে অপপ্রচার

গত ২৯ অক্টোবর ২০১২ দিবাগত রাত আনুমানিক ২:০০ টায় সুবলং বাজার এলাকায় ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসী ক্যাডারদের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাসুদের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী সদস্য রূপময় চাকমা নামে এক হাবাগোবা যুবককে আটক করে এবং পরবর্তীতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে চুক্তির পক্ষের লোক বলে প্রচার করে।

জানা যায়, আটককৃত রূপময় চাকমা (২৫) পীং নলিনী কুমার চাকমা, গ্রাম দীঘলছড়ি, সুবলং ইউনিয়ন, বরকল উপজেলা অত্যন্ত সাধারণ এক যুবক, কিছুটা হাবাগোবা এবং ছিঁচকে চুরিতে অভ্যস্ত বলেই নিজ এলাকায় পরিচিত। তার কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার প্রশ্নই আসে না।

জানা যায়, ঐদিন গভীর রাত্রে রূপময় সুবলং বাজার সংলগ্ন মাজারের পার্শ্ববর্তী ঘাটে এক নৌকায় অবস্থান করছিল। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সে তার গ্রাম দীঘলছড়ি থেকেই না বলে জনৈক গ্রামবাসীর ঐ নৌকাটি এনেছিল। এদিকে স্থানীয় সেনাক্যাম্পের নাকের ডগায় সুবলং বাজারে অবস্থান করা ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র ক্যাডাররা তাকে দেখতে পেয়ে প্রতিপক্ষ ভেবে সেনাক্যাম্পে খবর দেয়। এরপর ক্যাপ্টেন মাসুদের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী সদস্য ও হক্করক চাকমার নেতৃত্বে একদল ইউপিডিএফ ক্যাডার তৎক্ষণাৎ সেখানে যায় এবং রূপময় চাকমাকে আটক করে নিয়ে আসে। আটকের পর ইউপিডিএফ সদস্যদের সম্মুখে সেনা সদস্যরা রূপময় চাকমাকে অমানষিকভাবে মারধর করে এবং জনসংহতি সমিতির ব্যাপারে নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য বলতে বাধ্য করে। এমন অমানষিকভাবে মারধর করে যার ফলে একপর্যায়ে যা জিজ্ঞাসা করা হয় তাই স্বীকার করে থাকে। এমনকি সেই স্বীকারোক্তির রেকর্ডিংও করা হয় বলে জানা যায়। এর পরের দিন দুপুরে ইউপিডিএফের কর্মীদের মাধ্যমে মাজারের পাশে একটি দেশীয় তৈরী পাইপগান ও তিন রাউন্ড তাজা গুলি রেখে দিয়ে ঐ অস্ত্র ও গুলি রূপময় চাকমার স্বীকারোক্তির পর পাওয়া গেছে বলে সেনাবাহিনী দাবি করে। পরে তাদের দেয়া অস্ত্র ও গুলি দিয়ে সেনাবাহিনী রূপময় চাকমাকে বরকল থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এভাবে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে রূপময়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রূপময়কে চুক্তির পক্ষের সশস্ত্র লোক দাবি করে মিডিয়ায় প্রচার করে।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা

মহালছড়িতে কনে দেখতে এসে সংস্কারপন্থীদের হাতে অপহরণের শিকার বাঘাইছড়ির এক ওয়ার্ড মেম্বার

গত ৫ জুলাই ২০১২ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড মেম্বার বাঁশী মোহন কার্বারী (৪০) পীং- জয়ধন চাকমা, গ্রাম- পাকোয়াখালী ছেলের পক্ষের সাথে কনে দেখতে এসে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন মুবাছড়ি ইউনিয়নের গিন্নি অং করল্যাছড়ি এলাকা থেকে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহরণের শিকার হন।

জানা যায়, ঐ দিন বিকেল বেলায় সুদূর বাঘাইছড়ির পাকোয়াখালী এলাকা থেকে ভাবী বরের বাবা পৃথ্বীরাজ চাকমা (৪৫), অপর দুই গ্রামবাসী সুভাষ চাকমা (৪০) ও ধনার্ধন চাকমা (৫০) এবং উক্ত ওয়ার্ড মেম্বার মহালছড়ির মুবাছড়ি এলাকার গিনিঅং করল্যাছড়ি গ্রামে ভাবী কনের বাবা সুধাবিন্দু চাকমার বাড়িতে পৌঁছেন।

উল্লেখ্য, মুবাছড়ির বাসিন্দা সুধাবিন্দু চাকমার মেয়ে তুঙ্গোবি চাকমা (২০) পালিয়ে গত কয়েকদিন আগে বাঘাইছড়ির পাকোয়াখালী এলাকার উক্ত পৃথ্বীরাজ চাকমার ছেলের বউ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় তাদের বাড়িতে উঠে। এই কারণে পৃথ্বীরাজ চাকমা গ্রামের অন্যান্য মুরুব্বীদের নিয়ে মহালছড়িস্থ তার ঘরে উঠা মেয়ের বাবা সুধাবিন্দু চাকমার বাসায় যান। এদিকে সুধাবিন্দু চাকমার বাড়িতে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের একটি দল বাঘাইছড়ি থেকে আসা উক্ত ৪ জনকেই আটক করে বেঁধে ফেলে। এর কিছুক্ষণ পর অন্যান্যদের ছেড়ে দিয়ে সন্ত্রাসীরা মেম্বার বাঁশী মোহন কার্বারী (৪০)কে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

বন্দুকভাঙ্গাতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৯ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৫ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭:০০ টায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র দল কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন এলাকা থেকে ৯ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়েছে। ঐ সময় গ্রামবাসীরা কান্ট্রি-বোটে রাঙ্গামাটি সদরের উদ্দেশে আসছিল। উল্লেখ্য, সেদিন ছিল বুধবার, রাঙ্গামাটি বাজার বার। অপহৃত ব্যক্তিরা হল)– ১) বিজয় চাকমা (৩৮) পীং- রাজকধন চাকমা, গ্রাম- করল্যামুড়া পাড়া; ২) চন্দ্র শেখর চাকমা (২৫) পীং- কুরকুত্যা চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৩) তরুণ চাকমা (২৯) পীং- কোগিল চগা চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৪) অরুণ চাকমা (৪২) পীং- কোগিল চগা চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৫) সাধন মিত্র চাকমা (৩০) পীং- আনন্দ মোহন চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৬) মিন্টু চাকমা (৩৩) পীং- কিনাধন চাকমা, গ্রাম- পলাদ-আদাম; ৭) সুমন চাকমা (৩০) পীং- সতীশ চাকমা, গ্রাম- পলাদ-আদাম; ৮) জ্ঞানরতন চাকমা (৩৩) পীং- সূর্যধন চাকমা, গ্রাম- সাহসবান্দা; ৯) ইন্দ্র রঞ্জন চাকমা (৩৫) পীং- বুদ্ধমনি চাকমা, গ্রাম- সাহসবান্দা।

চট্টগ্রামে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের দু' সদস্যের উপর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলা

গত ৭ জুলাই ২০১২ চট্টগ্রাম শহরের বন্দর এলাকায় নিউমুরিং এলাকায় পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বন্দর কমিটির সদস্য বড় চাকমা (২৬) ও বিদেশ চাকমাকে (২৫) ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী সদস্যরা হামলা করে। উক্ত হামলায় গুরুতর আহত হলে বড় চাকমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ঐদিন রাত ৭:৩০টার দিকে বড় চাকমা ও বিদেশ চাকমা নিউমুরিং এলাকায় বাজার করতে গেলে সুমন চাকমা, সুপ্রিম চাকমা ও বিজয় চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল দিয়ে আক্রমণ করে। ভারী ইট দিয়ে আঘাত করার ফলে বড় চাকমা ও বিদেশ চাকমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতরভাবে জখম হয়।

মানিকছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসীকে হত্যার চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার ভালুপাড়া গ্রামে গত ৪ আগস্ট ২০১২ গভীর রাতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পাই সাজাই মারমা ওরফে মাষ্টার নামক একজন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থককে হত্যার চেষ্টা করেছে।

জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট ২০১২ শনিবার রাত ১২.৫০ টায় একদল সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী মানিকছড়ি উপজেলার ভালুপাড়া গ্রামে মৃত ডাক্তার অংসা মারমার ছেলে পাই সাজাই মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। এ সময় তার চিৎকারে গ্রামবাসীরা এগিয়ে আসে এবং পালানোর সময় পাই সাজাই মারমার সাথে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। পরে তাকে লক্ষ্য করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পাই সাজাই মারমা প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ধাওয়া করলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

রাঙ্গামাটির রাজদ্বীপ থেকে আদিবাসী দিবসের প্রাক্কালে ইউপিডিএফ কর্তৃক ২৪ জন ব্যক্তিকে অপহরণ

গত ৮ আগস্ট ২০১২ সন্ধ্যা ৭:৪৫ এর দিকে ইউপিডিএফ কমপক্ষে ২৪ জন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি পৌরসভাধীন রাজদ্বীপ এলাকার লিচু বাগান থেকে অপহরণ করে। জানা যায়, সন্ধ্যা ৭:৪৫ টার দিকে ইউপিডিএফ এর একটি সশস্ত্র দল ট্রলার যোগে হঠাৎ লিচু বাগানের যাত্রী ছাউনীতে পৌঁছে এবং নৌকার সকল যাত্রীদের আটক করে। তারপর একজন মহিলা যাত্রীকে বাদ দিয়ে সকল পুরুষ যাত্রীদের বন্দুকের নলের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। হামলার সময় সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করার জন্য আদেশ দেয়।

অপহরণের অব্যবহিত পরে রাতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ১৩ ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়। মুক্তিপ্রাপ্ত ১৩ ব্যক্তির মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেয়ে তারা হলেন- সুজত চাকমা (২৮) পীং শিব রঞ্জন চাকমা, শুক্র মারমা (২৭) পীং ক্রথোয়াই মারমা, সুপ্রকাশ চাকমা সাবু (২৬) পীং সুনয়ন চাকমা, পিপুল চাকমা (১৭) পীং জিতেন্দ্র চকমা, লেন্দু চাকমা (২৬), রূপায়ন চাকমা (২৪) পীং যতীন্দ্র চাকমা, নিখিল চকমা (৩৪), সিন্দু চাকমা (৩০), সুভাগ্য চকমা, চিক্কুয়া চাকমা এবং মুজিব চাকমা।

অবশিষ্ট ১১ জনকে মুক্তি দেয় ৯ আগস্ট রাত্রে। ৯ আগস্ট রাত্রে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেন- সাধন চাকমা (৩২), অরিফ্যা চাকমা (২৭), নিরূপম চাকমা (৩০), সুভাস চাকমা (৫৫), শৈবাল দেওয়ান (২৮), প্রবাল দেওয়ান (৩১) পীং উদয়ন দেওয়ান, বিশ্ব নাথ চাকমা (২১), বিদ্যামোহন চাকমা, সুগতি চাকমা (৩৫) এবং অনি চাকমা (২৬)। অপহরণ ঘটনাটি বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপনের একদিন আগে সংঘটিত হয়েছিল। সন্দেহ করা হয় আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেবার জন্য ও রাঙ্গামাটি শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল।

লংগদুতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণ

গত ১২ আগস্ট ২০১২ রাত ৮:০০ টার দিকে ইউপিডিএফের একটি সন্ত্রাসী দল রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন আটরকছড়া ইউনিয়নের তিন জন জুম্মকে তাদের বাড়ি থেকে অপহরণ করে। অপহৃত ব্যক্তিরা হচ্ছেন- জয়ন্ত চাকমা (৪০) পীং যামিনী কুমার চাকমা, সাং চোদকিছড়া; তনো চাকমা (২৫) পীং দুর্গামুণি চাকমা, সাং উগুদোছড়ি এবং অমর বিকাশ চাকমা (২৬) পীং বিজুধন চাকমা, সাং- উগুদোছড়ি। জানা গেছে যে, রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাবু পাড়ার নিবাসী জুপিটার চাকমার নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীরা ছিল ১০/১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল। পরে এলাকাবাসীর প্রবল চাপে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ১৩ আগস্ট ২০১২ রোজ সোমবার খাগড়াছড়ি'র দীঘিনালা উপজেলাধীন মেরুং ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের প্রিয়তম চাকমা (৩৬) পিতা- হৃদয় চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- লাম্বাছড়াকে লংগদু উপজেলাধীন ডানে আটারকছড়ার ডাঙ্গা বাজার থেকে তাতিন্দ্র লাল চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ানের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রিয়তম চাকমা নিজস্ব মোটর সাইকেল যোগে ভাড়া নিয়ে যাত্রী বহন করে থাকেন। ঘটনার দিন লংগদু উপজেলাধীন ডাঙ্গা বাজার পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে আসলে প্রীতি চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে তাকে বিকাল ৩:০০ টায় অপহরণ করে নিয়ে যায়।

বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দিন প্রিয়তম চাকমার কন্যা এসএসসি পরীক্ষার্থী মিকা চাকমাকে সংস্কারপন্থী কালেক্টর সুব্রত চাকমা ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনায় মেয়েটির বাবা প্রিয়তম চাকমা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। উক্ত ঘটনার রেশ ধরে প্রতিশোধমূলক সাজানো অভিযোগ এনে তাকে অপহরণ করে বলে জানা যায়। পরে গত ১৫ আগস্ট আনুমানিক দুপুর ১:০০ টার দিকে তাকে ছেড়ে দেয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযোগের কোন সত্যতা না পেয়ে সংস্কারপন্থী অন্য কর্মীরা স্থানীয় মুরুব্বীদের ডেকে প্রিয়তম চাকমারকে তাদের নিকট তুলে দেয়।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক একজন নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

খাগড়াছড়ি'র দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া বাজার থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গত ১৩ আগস্ট ২০১২ রোজ সোমবার নাড়াইছড়ি গ্রামের গোলক চন্দ্র চাকমার ছেলে কামিনী রঞ্জন চাকমাকে (৫৫) অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কামিনী রঞ্জন চাকমা ১২ আগস্ট ২০১২ রোজ রবিবার নৌকা যোগে নাড়াইছড়ি বাজার থেকে বাবুছড়া বাজারে চলে আসেন। সেখানে সেদিন তিনি অবস্থান করেছেন। তারপর দিন সকাল আনুমানিক ৮/৯ টার দিকে প্রীতি চাকমা ও মিলন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একটি সশস্ত্র গ্রুপ এসে তাকে ধরে অপহরণ করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তিনি নাড়াইছড়ি বাজারের একজন দোকানদার এবং উক্ত বাজারে তার একটা বোর্ডিং রয়েছে। জানা গেছে, তিনি নাকি চুক্তিপক্ষের লোকদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ও সহযোগিতা করেন এ অজুহাতে তাকে অপহরণ করা হয়ে থাকে। পরে তাকে নির্যাতন চালিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক মাটিরাঙ্গার গোমতি ইউনিয়নে এক গ্রামবাসীকে মারধর

খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নে গত ১৯ আগস্ট ২০১২ এক গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মারধর করেছে বলে জানা যায়। জানা যায়, গত ১৯ আগস্ট ২০১২ খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের উদয় কুমার কার্বারী পাড়া বাসিন্দা ক্ষেত্র মোহন ত্রিপুরা, পিতা- পঞ্জিকা চরণ ত্রিপুরাকে ইউপিডিএফ-এর 'গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম' এর মাটিরাঙ্গা এলাকার সন্ত্রাসী জনলাল ত্রিপুরা, পিতা- মৃত আনন্দ মোহন ত্রিপুরা, গ্রাম- সর্বসিদ্ধি পাড়া, ১৯৫ নং বামা গোমতি মৌজা ডেকে নিয়ে বেদম মারধর করে। তাকে মারধর করার সময় প্রশ্ন করা হয়, কেন তাকে অন্যায়ভাবে মারাধর করা হচ্ছে। এ সময় অত্যাচারী জনলাল ত্রিপুরা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা জানায় যে, 'ইউপিডিএফের কার্যকলাপের কারণে গোমতীবাসী মারা যাবে' এ ধরণের মন্তব্য করায় তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

সুভলঙে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক একজন ইউপি মেম্বারকে অপহরণ, মারধর ও মুক্তিপণ আদায়

গত ১৬ আগস্ট ২০১২ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের চন্দ্র কুমার চাকমা নামে জনৈক (২ নং ওয়ার্ড) মেম্বারকে সুভলং এলাকা থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র দল অপহরণ করে।

অপরদিকে একই ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড মেম্বার বিমলেন্দু চাকমা বান্দিকে (৪৫) সুভলং-এ এক সপ্তাহের অধিক গৃহবন্দী করে রাখে। জানা যায় যে, সপ্তাহখানেক আগে বিমলেন্দু চাকমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছিল এবং তাকে বলা হয় যে, তিন দিন পরে তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাকে জানানো হবে।

১৬ আগস্ট ২০১২ চন্দ্র কুমার চাকমা, সুভলং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তরুণ জ্যোতি চাকমা, সুভলং ইউনিয়নের মহিলা মেম্বার মিসেস বনলতা চাকমা, ১ নং ওয়ার্ড মেম্বার কান্তি চাকমা এবং মধুমিলনসহ শিলছড়ি আজাছড়া এলাকায় ইউপিডিএফের সাথে দেখা করতে যান এবং বিমলেন্দু চাকমার গৃহবন্দীর আদেশ প্রত্যাহার করার সম্পর্কে আলাপের চেষ্টা করেন।

এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অভিযোগ করেন যে, চন্দ্র কুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থন করে বলেই তাকে অপহরণ করা হয়েছে। জানা যায় যে, জনৈক রিপন চাকমা এই ১০/১২ সদস্য বিশিষ্ট এই ইউপিডিএফ এর দলনেতা।

যদিও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরা চন্দ্রকুমার চাকমাকে মুক্তি দেবার অনুরোধ করলেও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাকে বন্দুকের নলের মুখে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বলে যায় যে, যদি ১৭ আগস্ট ২০১২ দুপুর ১২.০০ টার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকাসহ তাদের সাথে যোগাযোগ না করা হলে চন্দ্র কুমার চাকমাকে হত্যা করা হবে। পরে ১৭ আগস্ট দুপুর ১২.০০ টায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা স্থানীয় জনগণের প্রবল চাপের মুখে ও আড়াই লক্ষ টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সুভলং এলাকার স্থানীয় জুম্মদের কাছ থেকে ১১০ টি মোবাইল সেট জব্দ করেছে বলে জানা যায়।

লক্ষ্মীছড়িতে এক নিরীহ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অস্ত্রের মুখে অপহৃত

খাগড়াছড়ি'র লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার শুকনাছড়ি গ্রাম থেকে গত ১৯ আগস্ট ২০১২ রোজ রবিবার রাত আনুমানিক ১০টার ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তপন চাকমা নামের একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ আগস্ট ২০১২ রোজ রবিবার রাত আনুমানিক ১০টার সময় লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার মধ্যম বর্মাছড়ি গ্রামের কর্ণ কুমার চাকমার ছেলে সুনীল কান্তি চাকমা ওরফে তরেন (৩২) এর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী শুকনাছড়ি গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা উত্তর শুকনাছড়ির গ্রামবাসী তপন চাকমা (১৬) পিতা-কিরণ চন্দ্র চাকমাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর ২ মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এখনও তাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে অপহরণকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করেছে।

বান্দরবানের বালাঘাটায় ইউপিডিএফের তান্ডব, ২ নিরীহ গ্রামবাসী আহত

গত ২৩ আগস্ট ২০১২ বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকার সময় বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের কুলাক্ষ্যং চাকমা পাড়ার চারজন যুবক যথাক্রমে সনজিত চাকমা (১৬) পিতা শান্ত শীল চাকমা, শ্যামল চাকমা (১৫) পিতা দয়ানন্দ চাকমা, রনজিত চাকমা (১৬) পিতা বীরসেন চাকমা ও আনন্দ লক্ষী চাকমা (২২) পিতা অতুলরঞ্জন চাকমা বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা বাজারে ফুটবল কিনতে আসলে বিক্রম তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে বিজয় মারমা, শুদ্ধমণি তঞ্চঙ্গ্যা, রনি তঞ্চঙ্গ্যা, পাইমং মারমা, উটিং মারমা, রকি তঞ্চঙ্গ্যাসহ ৮-১০ জন ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী তাদেরকে বালাঘাটা বাজারে (চড়ুই পাড়া রাস্তা মোড়) ঘিরে ফেলে এবং সনজিত চাকমাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে বিকাল ৪.৪৫ ঘটিকায় কুলাক্ষ্যং চাকমা পাড়া হতে ৩০-৪০ জন গ্রামবাসী এসে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং বালাঘাটা বাজারে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে বাজারের পাশে অবস্থান নেয়। পরে আবার ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর ১২-১৫ জন কর্মী লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে হামলা চালালে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে বালাঘাটা বাজার হতে বাঙালিরা ইউপিডিএফের পক্ষ নিলে কুল্যাক্ষ্যং পাড়াবাসী লোকজন পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং চড়ুই পাড়া রাস্তায় মুসলিম পাড়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। এ হামলায় প্রংওয়াং পাড়ার ক্যাহ্লা মং মারমা পিতা মৃত মংগুলি মারমা আহত হয়। এ সময় কুলাক্ষ্যং চাকমা পাড়ার ২ জন আহত হয় বলে জানা যায়। এরপর বান্দরবান বাজার হতে ফেরার পথে কুলাক্ষ্যং চাকমা পাড়ার চিকনা চাকমা কার্বারীকে একা পেয়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা তার উপর হামলা চালায় এবং তিনি গুরুতর আহত হন।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বান্দরবান সদর হতে মংস্ত মারমার নেতৃত্বে পিসিপি'র ২০-২৫ জন কর্মী কুল্যাক্ষ্যং পাড়াবাসীদের বালাঘাটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তখন বালাঘাটা বাজারে অধিকহারে পুলিশ ও বাঙালিদের অবস্থান থাকায় বালাঘাটায় না নেমে মুসলিম পাড়ায় গিয়ে এলাকাবাসীর সাথে মিলিত হন। পরে বান্দরবান জেলার জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের পর যার যার জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে প্রথমে কুলাক্ষ্যং চাকমা পাড়ার লোকজনদেরকে গাড়িতে করে গ্রামে পাঠানো হয় এবং মংস্ত মারমার নেতৃত্বের দলটি ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে বান্দরবান থানার ওসি ইমতিয়াজের নেতৃত্বে একটি পুলিশের গাড়ি ও তিনটি আর্মির গাড়ি গিয়ে মংস্ত মারমাসহ নিত্যলাল চাকমা, জেমশন আমলাই, অংক্যচিং মারমা, উবাসিং মারমা, সুজয় চাকমা, জীবন চাকমা, অজিত তঞ্চঙ্গ্যা, অংচ মারমা, রাজেশ তঞ্চঙ্গ্যাসহ মোট ১০ জন এবং কুলাক্ষ্যং চাকমা পাড়া হতে নিরীহ ১৩ জন গ্রামবাসী সহ মোট ২৩ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পরে পুলিশের দায়ের করা সাজানো চাঁদাবাজি মামলায় দয়ারঞ্জন চাকমা, কিরণ চাকমা ও বুদ্ধসেন তঞ্চঙ্গ্যা নামে তিনজন নিরীহ গ্রামবাসীকে জেলে পাঠানো হয় বাকীদের সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে পর্যায়ক্রমে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কাউখালী উপজেলায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী নির্যাতনের শিকার

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ শনিবার রাত ৮টার সময় রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া মৌজার জুনুমাছড়া গ্রামে লক্ষণ সেন চাকমার ছেলে মজিব চাকমা (৩৪) নামের এক নিরীহ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

জানা গেছে, পারিবারিক সমস্যার জের ধরে ঘটনার সময় ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী কাউখালী ইউনিট পরিচালক অনি চাকমা, কচুখালী মৌজার তালুকদার পাড়া গ্রামের গোপাল চাকমার

ছেলে অনিয়ন চাকমা ও চাঁদা উত্তোলনকারী উনু মারমার নেতৃত্বে ৬/৭ জন সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী উক্ত মজিব চাকমাকে নোয়াপাড়া নামক গ্রামে ডেকে নিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় শারীরিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে তার ডান হাত ও একটি আঙ্গুল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। পরে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়ে মারাত্মক আহত অবস্থায় মজিব চাকমাকে স্থানীয় ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য দীপেন চাকমা ওরফে প্রকাশ সুন্দরমনি ও বিমল কান্তি কার্বারী নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে মজিব চাকমা (৩৪) স্ত্রী ও ২ ছেলেকে নিয়ে আর্থিক সংকটের কারণে সুচিকিৎসার অভাবে বাড়িতে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ইউপিডিএফ সদস্য কর্তৃক তাদের এক সমর্থক নির্যাতনের শিকার

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার তৈলাফাং মৌজাস্থ বরনাল ইউনিয়নের সুরেন্দ্র মেম্বারপাড়া গ্রামের একতারা ত্রিপুরা (৪৫) পিতা- মৃত সেনভদ্র ত্রিপুরাকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নির্যাতন করেছে। জানা যায়, গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ আনুমানিক ভোর ৬:০০ টার সময় ইউপিডিএফ চিফ কালেক্টর জিরান চাকমা (৪৫) এর নেতৃত্বে ৬ জনের সশস্ত্র একদল ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী সুরেন্দ্র মেম্বারপাড়া গ্রামের একতারা ত্রিপুরাকে বাড়ি থেকে বের করে লাঠি দিয়ে মারপিট করে মারাত্মকভাবে আহত করে।

একতারা ত্রিপুরা আসলে একজন ইউপিডিএফ সমর্থক বলে জানা যায়। মারপিট করার সময় তাকে বলা হয়েছিল, সে নাকি ইতিমধ্যে আর্মি ও বিজিবির গোয়েন্দার কাজ করছে। তাই তারা ডাকলে একতারা ত্রিপুরা তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে না। মারধর করে চলে যাবার সময় হুমকি দেয় যে, এর পরিণাম একতারা ত্রিপুরার জন্য শুভ হবে না।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলায় একজন গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল ৮ টায় লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরের হাসপাতাল এলাকায় রূপন চাকমা (৩২) বাজার করতে গেলে বিঝু চাকমার নেতৃত্বে ১০/১২ জন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী মোটর সাইকেল যোগে এসে তাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। জানা যায়, এ ঘটনায় তিনি বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ধুইল্যাতলী ইউনিয়নের বান্দরকাটা গ্রামের কালাচাঁন চাকমার ছেলে। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে প্রেরণ করা হয়।

চট্টগ্রামে ফ্রি-পোর্টে অস্ত্র ও গুলিসহ ইউপিডিএফের ভাড়া করা পেশাদার সন্ত্রাসী আটক

গত ১৭ অক্টোবর ২০১২ রাতে বন্দর থানা পুলিশ বন্দর থানাধীন ফ্রি-পোর্ট ঝনক প্লাজা মার্কেট সংলগ্ন ছাবের বিল্ডিংয়ের ছাদ হতে দুই রাউন্ড কার্তুজ ও রিভলবারসহ মো. রাসেল (২৩) ও তানবির মো. সজিব (২০) নামে ইউপিডিএফের ভাড়া করা দুই পেশাদার খুনীকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা যায় যে, ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থক পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঐ দু'জন সন্ত্রাসীকে ভাড়া করে। পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার সময় গোপন সংবাদ পেলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিন তলাবিশিষ্ট ওই ভবনের ছাদ থেকে উক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করে। তবে পুলিশ তাদেরকে ডাকাত বলে গ্রেফতার দেখায়।

বাঘাইছড়িতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ নিরীহ গ্রামবাসী প্রহৃত

গত ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০১২ দুই দিনে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলায় তথাকথিত সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৩ নিরীহ গ্রামবাসী বেদম প্রহারের শিকার হয়। জানা যায়, জুপিটার চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী সশস্ত্র ক্যাডাররা মনগড়া নানা অভিযোগ তুলে ২৪ অক্টোবর উপজেলার বাঘাইছড়ি রাবার বাগান এলাকার প্রতিময় চাকমা (৫০) পীং তরুলক্ষ চাকমা ও পূর্ণসেন চাকমা (৩২) পীং যাত্রামোহন চাকমাকে এবং ২৫ অক্টোবর বাঘাইছড়ি গ্রামের প্রভাত তালুকদার (৪৫) পীং গোপাল কৃষ্ণ তালুকদারকে বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে নানা মনগড়া অভিযোগ তুলে বেদম প্রহার করে।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ জন পাহাড়ি যুবক আটক

গত ২৬ অক্টোবর ২০১২ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচরের ১৮ মাইল থেকে ১ জন এবং খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার আলুটিলা এলাকা থেকে ১ জন পাহাড়ি যুবককে গাড়ি থেকে নামিয়ে অপহরণ করে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঐদিন সকাল ৮:০০ টায় চট্টগ্রাম থেকে মহালছড়িমুখী একটা বিরতিহীন বাসে করে চট্টগ্রামের এক কোম্পানীতে চাকুরিরত রিপন চাকমা (২৩) পিতা- রাঙামূয়া চাকমা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার ভয়াত্যাপাড়ায় নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেন।

আসার পথে রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার ১৮ মাইল এলাকায় সকাল আনুমানিক ১১:৩০ টায় গাড়িটি পৌঁছলে প্রজিৎ চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ এর একদল সন্ত্রাসী রিপন চাকমাকে গাড়ি থামিয়ে অপহরণ করে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকা থেকে কয়েকজন মিলে ভাড়া করা গাড়িতে করে আসার পথে সকাল আনুমানিক ১০:০০ ঘটিকার সময় গাড়িটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার আলুটিলা পর্যটন এলাকায় পৌঁছলে শিবু চাকমার নেতৃত্বে একদল ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী গাড়ি থামিয়ে ভূষণ চাকমা (২২) পিতা শম্ভু লাল চাকমা, গ্রাম জীবতলী, থানা বাঘাইছড়িকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

দীঘিনালায় ভারত প্রত্যাগত এক শরণার্থী সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত

গত ২৭ অক্টোবর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একজন সক্রিয় সমর্থক ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী সুনীতি রঞ্জন চাকমা (৪৫) পিতা বৃষসেন চাকমা গ্রাম বাজেছড়া সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

জানা যায়, ঘটনার সময় সুনীতি রঞ্জন চাকমা মেরুং বাজারস্থ তার নিজস্ব আশা তৃপ্তি ফার্মেসী দোকানটি বন্ধ করার সময় সুগত চাকমা ওরফে সুব্রত চাকমা (৩৫) পিতা জ্ঞান লাল চাকমা, গ্রাম কজোইছড়ি, বাঘাইছড়ির নেতৃত্বে ৪ জন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী সেখানে এসে খুব কাছ থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি পেটের বাম পাশে দুটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশপাশের লোকজন তাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় প্রথমে দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার পর খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে সেদিন রাত আনুমানিক ১০ টায় চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠায়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮ অক্টোবর ২০১২ দুপুরে তার মৃত্যু হয়। সুনীতি রঞ্জন চাকমাকে গুলি করে পালিয়ে যাবার সময় উত্তেজিত জনতা সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে বিনয় চাকমা (১৫) নামের একজনকে একটি এলজি ও দুই রাউন্ড গুলিসহ ধরে ফেলে ও গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোর্পদ করে। অন্য তিনজন সন্ত্রাসী পালিয়ে যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফকে গণপিটুনী এবং পরে ৫ জন গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ৩০ অক্টোবর ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা ইউনিয়ন ও গুইমার মৌজার বাল্যাছড়ির সুরেশ কুমার ত্রিপুরা মেম্বার পাড়ার ১ নং রাবার বাগান এলাকার গ্রামবাসীরা ইউপিডিএফের ২ জন চাঁদাবাজকে ধাওয়া করে। তম্মধ্যে কিরণ নামে একজন সন্ত্রাসী পালিয়ে গেলেও রিপন ত্রিপুরা নামে একজন ধরা পরে এবং গণধোলাইয়ের শিকার হয়। উক্ত গণধোলাইয়ের প্রতিশোধ হিসেবে সেদিন বিকালে ঐ গ্রামের ৫ জন গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জানা যায়, ২৯ অক্টোবর ২০১২ ঐ গ্রামের রাবারচাষীদের নিকট হতে ইউপিডিএফ কালেক্টররা নগদ ৩,০০০ টাকা চাঁদা আদায় করে নিয়ে যায়। ফলে রাবারচাষীরা ৩০ অক্টোবর কাঁচা রাবার বাজারে বিক্রয় করতে যাওয়ার সময় ইউপিডিএফ চাঁদাবাজরা আরো চাঁদা দাবি করে এবং চাঁদা না দেয়া পর্যন্ত রাবারচাষীদের রাবার আটক করে। ফলে প্রথমে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে এলাকাবাসীরা ইউপিডিএফের রিপন ত্রিপুরাকে ধরে ফেলে গণপিটুনী দেন। পরে ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসীদের মধ্যে তা জানাজানি হলে ঐ গ্রাম থেকে ৫ জন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। অপহৃত ৫ জন গ্রামবাসী হচ্ছেন- উগ্য মারমা (২৫) পিতা আথোয়াই মারমা, উষাপ্রুমারমা (৩৮) পিতা ক্যমং মারমা, কংজ মারমা (২৬) পিতা অংগ্যপ্রুমারমা, উষয়েং মারমা (১৬) পিতা অংগ্য প্রুমারমা (এসএসসি পরীক্ষার্থী) এবং আপ্রুচি মারমা।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন লংগদু ইউনিয়নের বদনীছড়া গ্রামের ননাধন চাকমা (২৫) পিতা ধীরেন্দ্র চাকমা নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে তার নিজ বাড়ি থেকে বিদ্যা রঞ্জন চাকমা ওরফে বিকল্প এর নেতৃত্বে একদল ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী অপহরণ করে। ৪০,০০০ টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে গত ২ নভেম্বর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দেয়। তাদের অনুমতি ছাড়া গ্রামের বাইরে কোথাও যেতে পারবে না বলে ননাধন চাকমাকে শর্তারোপ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি শহর এলাকা থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন নিরীহ ছাত্রকে অপহরণ

গত ১ নভেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটি উপজেলার কুতুকছড়ি এলাকা থেকে প্রিয় জ্যোতি চাকমা, কল্প রঞ্জন চাকমা ও গৌতম চাকমা নামে তিনজন নিরীহ ছাত্রকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। জানা যায় যে, গৌতম চাকমার বাড়ি রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ির বোধিপুর এলাকায়। তার আমন্ত্রণে প্রিয় জ্যোতি চাকমা ও কল্প রঞ্জন চাকমা বোধিপুর বিহারে চীবরদানোৎসবে বেড়াতে গেলে বিহার এলাকা থেকে ঐদিন রাত ১১:০০ ঘটিকায় রিপন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা তাদেরকে অপহরণ করে।

অপহরণের পর অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে সারা রাত তাদেরকে মাধধর করে। তারপর দিন ২ নভেম্বর তাদেরকে কুতুকছড়ি এলাকার বোধিপুর বিহার রাস্তা বরাবর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে।

অপহৃতদের মধ্যে প্রিয় জ্যোতি চাকমা চট্টগ্রামের শ্যামলী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ৫ম সেমিস্টারের ছাত্র, কল্প রঞ্জন চাকমা রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর এবং গৌতম চাকমা ফেনী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের ছাত্র বলে জানা গেছে। ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা প্রিয় জ্যোতি চাকমা ও কল্প রঞ্জন চাকমা থেকে যথাক্রমে ১,৬০০ টাকা ও ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

লংগদু উপজেলায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গৃহশিক্ষক অপহৃত

গত ১ নভেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু ও সোনাই এর মধ্যবর্তী অবস্থান ডুলুছড়ি বন বিহার থেকে আটারকছড়া ইউনিয়নের বামে আটারকছড়া গ্রামের বিকন চাকমা (২৫) পিতা- সবিরাজ চাকমা নামে এক নিরীহ গৃহশিক্ষককে

ডুলুছড়ি বন বিহার থেকে সংস্কারপন্থীর ৬ সদস্যের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জানা যায় যে, ১ নভেম্বর রাত ৮:৩০ টার দিকে ডুলুছড়ি বন বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবে গেলে সেখান থেকে সন্ত্রাসীরা বিকন চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ধরে নেওয়ার পর তাঁকে মারাত্মকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। তারপরদিন স্থানীয় মুরুব্বীদের চাপের মুখে এবং ১৫,০০০ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে সংস্কারপন্থীরা তাকে ছেড়ে দেয়। তবে শর্ত দেয়া হয় যে, তিনি আটারকছড়া থেকে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে শর্তে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া আরো ১০,০০০ টাকা মুক্তিপণ প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, নানিয়ারচর এলাকার একারাল্যাছড়ার স্মৃতিবিন্দু চাকমা ওরফে রাসেল ও গাইন্দ্যাছড়ি করল্যাছড়ির গ্রামের বিরাজ মোহন চাকমা ওরফে অসীম (৩৩) পিতা শোভাপ্রিয় তালুকদার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এই অপহরণ করে বলে জানা যায়।

সাংগঠনিক সংবাদ

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মকাঠামোতে অংশগ্রহণ

গত ৯-১৩ জুলাই ২০১২ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মপ্রণালী (এক্সপার্ট মেজানিজম অন দা রাইটস অব ইন্ডিজিনাস পিপলস) এর ৫ম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে সমিতির যুব বিষয়ক সহ সম্পাদক এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা যোগদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আরো অংশগ্রহণ করেন অদিবাসী অধিকার বিষয়ক মানবাধিকার সংগঠন 'কাপেং ফাউন্ডেশন' এর লিনা জেসমিন লুসাই, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বিনতাময় ধামাই।

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মপ্রণালীর ৫ম অধিবেশনের ৫ নং এজেন্ডা 'আদিবাসীদের অধিকার ও পরিচিতি প্রসার ও সংরক্ষণে ভাষা ও সংস্কৃতির ভূমিকা' এবং ৬ নং এজেন্ডা 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র' এর উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে বিধায়ক চাকমা লিখিত বক্তব্য করেন। তাঁর লিখিত বক্তব্যে বিধায়ক চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের বেলায় আদিবাসীদের অধিকার ও পরিচিতি প্রসার এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে চলেছে। এজন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে প্রভাবিত করতে আদিবাসী অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মপ্রণালীসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান।

পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ চট্টগ্রামের রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত জোন এলাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও, শ্রমজীবী মানুষের আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের সভাপতি সিকো চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার। এছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস হোর, চট্টগ্রাম ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের সদস্য ও গণঐক্য কমিটির সদস্য তপন দত্ত, পিসিপির চবি শাখার প্রাক্তন সহ সভাপতি অভিলাষ চাকমা, পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক টিন চাকমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুকাম চাকমা বক্তব্য প্রদান করেন। সম্মেলনে শ্রমজীবী মানুষের আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ

বাস্তবায়ন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা বেতন, যথাযথ ঘরভাড়া নীতি প্রণয়ন, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, নারী শ্রমিক হয়রানি বন্ধকরণ ইত্যাদি দাবি তুলে ধরা হয়। পরিশেষে সিকো চাকমাকে সভাপতি, সুকাম দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক, পূর্ণ বিকাশ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও অনিল চাকমাকে অর্থ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

চাঁদগাঁও শাখা গঠন: এর আগে গত ৩ আগস্ট ২০১২ পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের চাঁদগাঁও শাখা গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পাহাড়ি ছাত্রাবাসে সম্মেলনে চাঁদগাঁও অঞ্চলের পাহাড়ি শ্রমিকরা যোগদান করেন। জওহর লাল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক টোয়েন চাকমা।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। এ সরকারের আমলেও জুম্ম জনগণের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহতভাবে চলছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে গড়িমসি করে চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কেবল একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। কিন্তু বাস্তবায়নের কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া থেকে উদ্বেগজনকভাবে বিরত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের ক্ষেত্রে নানা তালবাহানা করে চলেছে। অধিকন্তু বিতর্কিত খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে পুনরায় নিয়োগের ষড়যন্ত্র করছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

পরিশেষে জওহর লাল চাকমাকে আহ্বায়ক ও দীপঙ্কর চাকমাকে সদস্য-সচিব করে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের চাঁদগাঁও শাখার ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

বোমাং রাজার প্রয়াণে জনসংহতি সমিতির শোক

বোমাং রাজা অংশৈ প্রু চৌধুরীর মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করেছে। জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমার স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে সমিতি প্রয়াত বোমাং রাজার পুত্র-কন্যা ও পরিবার-পরিজনদের প্রতি জানিয়েছে গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

উল্লেখ্য, পার্বত্যাঞ্চলের বোমাং সার্কেল চীফ রাজা অংশৈ প্রু চৌধুরী ৮ আগস্ট সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বান্দরবান জেলা শহরের নিজ বাসভবনে ৯৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯৮ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি বোমাং সার্কেলের ১৫তম রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। বোমাং রাজা হিসেবে তিনি বোমাং সার্কেলের প্রজা সাধারণের সার্বিক উন্নয়নে ও জনমানুষের সেবায় নিবেদিত ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের

সদস্য এবং ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৭ ছেলে, ২ মেয়ে ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ৩য় বান্দরবান জেলা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৮ আগস্ট ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ৩য় বান্দরবান জেলা শাখা সম্মেলন বান্দরবান জেলা সদরস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে শ্রীমতি ওয়াইচিং প্রু মারমাকে সভাপতি ও শ্রীমতি মেঞ্চোচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন বান্দরবান জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

শ্রীমতি ওয়াইচিং প্রু মারমার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রীমতি জড়িতা চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য শ্রীমতি সোনারাণী চাকমা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা, জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি শ্রী উচসিং মারমা, মহিলা সমিতির বান্দরবান থানা

কমিটির সভাপতি শ্রীমতি মেপ্রুসাং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উবাচিং মারমা।

নেতৃবৃন্দ বিশ্বের যে কোন আন্দোলনের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এবং নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তারা আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের গড়িমসির জন্য তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

আলোচনা সভার পর দুই বছরের জন্য ওয়াইচিং প্রু মারমাকে সভাপতি, মেঞোচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ভদ্রা তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন বান্দরবান জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকায় ৭ রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, গণ আজাদী লীগ, গণ ঐক্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল), কমিউনিস্ট কেন্দ্র এই ৭টি রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে (১) সোনালী ব্যাংকের দুর্নীতি, হলমার্ক কেলেঙ্কারীতে ৪ হাজার কোটি টাকা লুট, (২) ৬ষ্ঠ বারের মতো বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি যা গ্রাহক পর্যায়ে মানুষের বহন করা দুঃসাধ্য, (৩) পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের উপর উপর্যপুরি হামলা, খুন-মামলা, জমি থেকে উৎখাত এবং (৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সুপরিকল্পিত হামলা-অগ্নিসংযোগ, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, জনজীবনের সমস্যা ইত্যাদি ইস্যুর উপর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

৭ দলের ঘোষণায় বলা হয় যে, বাংলাদেশ বহু জাতি ও বহু ভাষার এক ঐতিহ্যমণ্ডিত রাষ্ট্র। আদিবাসী জাতিসমূহ নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনবোধ দিয়ে বহুবিধ বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু নীতি-নির্ধারকরা দেশে কোন আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করছে না। অধিকন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীতে তাদের জাতিগত পরিচয় অস্বীকার করে দেশের সকল নাগরিকদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। ১৪ বছরের অধিক সময় পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন এখনও সম্পন্ন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন সংশোধনী আইনটি সরকারের উচ্চপর্যায়ে গৃহীত হলেও সংশোধিত আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনে অহেতুক বিলম্ব করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্নস্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। চট্টগ্রামের হাটহাজারী, সাতক্ষীরা, জামালপুর, দিনাজপুরের চিরির বন্দরের হিন্দু ধর্মালম্বী জনগণের উপর হামলা, বসত-ভিটায় অগ্নিসংযোগ করা, মন্দির ভাঙচুরের ঘটনাবলী একই কায়দায় সংগঠিত হয়েছে। দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে অবনতি ঘটেছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিধানে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ, আদিবাসী জাতিসমূহ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং সকল প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের বিকল্প নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া, জঙ্গীবাদ মুক্ত এবং শোষণ বৈষমহীন সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে এই ৭টি রাজনৈতিক দল একযোগে ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচির কার্যক্রমকে আরও জোরদার করবে বলে ঘোষণায় পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

পিসিপি'র নবীন বরণ, জুম্ম জাতীয় চেতনায় সংকীর্ণতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার অঙ্গীকার

গত ১৪ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়া নতুন জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় তিন শতাধিক নবীন ছাত্রছাত্রীসহ পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পিসিপির ঢাকা মহানগন শাখার সভাপতি জুয়েল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিন সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক

জেমশন আমলাই বম। জাতীয় সঙ্গীত ও পিসিপি'র দলীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অন্যদিকে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রগতিশীলতার সুর তুলি– এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক নবীনবরন ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়া হয় আর মাস্টার্স শেষবর্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের বিধায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুদেব চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার, বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত সভাপতি ড. রহমান নাসির উদ্দিন, ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত প্রভাষক আনন্দ বিকাশ চাকমা, জেএসএস কেন্দ্রীয় যুব দপ্তরের স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষমান চাকমা বুলবুল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। বিশেষ অতিথি ড. রহমান নাসির উদ্দিন তার বক্তব্যে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে ছাত্র সমাজকে সামিল হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার কেড়ে নিতে হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক বিমল চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত সভাপতি ড. রহমান নাসির উদ্দিন নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন আর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার বিদায়ীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও চ.বি শাখা পিসিপির পক্ষ থেকে তুর্য তালুকদার, নবীনদের পক্ষ থেকে গৌতম চাকমা আর বিদায়ীদের পক্ষ থেকে উবাথোয়াই মারমা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বিভিন্ন শাখা সম্মেলন

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অন্যতম সহযোগী সংগঠন, পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের লড়াকু হাতিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বিভিন্ন শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে বিগত ৪ মাসে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত শাখা

সম্মেলনের বিবরণ দেয়া হল–

বাঙালহালীয়া ইউনিয়ন শাখা: গত ৭ অক্টোবর ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি বাঙালহালীয়া ইউনিয়ন শাখার ১ম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। বাচিং মারমাকে সভাপতি, উথাইমং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও উথাইমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ঠ বাঙালহালীয়া ইউনিয়ন যুব সমিতি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা এবং নব নির্বাচিত বাঙালহালীয়া ইউনিয়ন যুব সমিতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান– পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সংগ্রামী সহ-সভাপতি চন্দন তনচংগ্যা।

দুমদুম্যা পূর্বাঞ্চল ইউনিয়ন শাখা: গত ৩০ আগস্ট ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি দুমদুম্যা পূর্বাঞ্চল ইউনিয়ন শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি কুমার তনচংগ্যাকে সভাপতি, নিরূপম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সত্যবান চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দুমদুম্যা ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব নির্বাচিত যুব সমিতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান- পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, জুরাছড়ি থানা শাখার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মায়াচান চাকমা।

ওয়াগ্গা ইউনিয়ন যুব শাখা: গত ৪ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ওয়াগ্গা ইউনিয়ন শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তনচংগ্যা। রুবেল তনচংগ্যাকে সভাপতি, বাবলু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও বিপুল তনচংগ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ওয়াগ্গা ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব নির্বাচিত ওয়াগ্গা ইউনিয়ন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান– পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির কাপ্তাই থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রূপম চাকমা।

আমছড়ি গ্রাম শাখা: গত ৪ অক্টোবর ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি আমছড়ি যুব শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল

অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কিশোর কুমার চাকমা। বিজয় চাকমাকে সভাপতি, সুখীময় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আমছড়ি গ্রাম যুব কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব নির্বাচিত যুব কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান– পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি সদর থানা শাখার সভাপতি শোভন চাকমা।

দুমদুম্যা পশ্চিম অঞ্চল ইউনিয়ন শাখা: গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি দুমদুম্যা পশ্চিম অঞ্চল ইউনিয়ন শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি, জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মায়াচান চাকমা। শুভরঞ্জন চাকমাকে সভাপতি, বিজয় শংকর চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও শান্তি বিকাশ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দুমদুম্যা পশ্চিম অঞ্চল ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

চিৎমরম ইউনিয়ন শাখা: গত ১৪ অক্টোবর ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি চিৎমরম ইউনিয়ন শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা। অসিং মং মারমাকে সভাপতি, অংসাপ্রুমারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মংসুঅং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চিৎমরম ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব নির্বাচিত চিৎমরম ইউনিয়ন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান– পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির কাপ্তাই থানা শাখার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক যুবনেতা রূপম চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় পিসিপি'র বিক্ষোভ

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ১২ রোজ শনিবার বিকাল ৪:৩০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক সংগঠন সমঅধিকার আন্দোলন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক রাঙামাটি শহরে পাহাড়িদের ঘর-বাড়ি, জীবন-মাল, দোকান-পাটের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা এবং জনপ্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষপাতমূলক আচরণ ও নীরব ভূমিকার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে টিএসসি'র রাজু ভাস্কর্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশ জেমশন আমলাই এর সঞ্চালনায় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জুয়েল চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ত্রিজিনাদ চাকমা, সভাপতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি; সুলভ চাকমা, সদস্য, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর; মুকুল ত্রিপুরা, সভাপতি, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম; অংচিং মারমা, সদস্য, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সি, ঝিমিত রান্ডাল, ছাত্র, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও অনন্ত ধামাই, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

সমাবেশে বক্তারা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মদদদাতাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, ঘটনায় আহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং অবিলম্বে যথাযথ ও দ্রুত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করার দাবি জানায়।

রাঙামাটিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় ৭ দলের মানববন্ধন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল ১০:৩০ টায় ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রগতিশীল ৭টি দল- পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণ ঐক্য, গণতন্ত্রী পার্টি, সাম্যবাদী দল, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণ আজাদী লীগ এর উদ্যোগে 'রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি বিরোধী দাঙ্গার হোতাদের বিচার ও শাস্তি এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে' এক মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এক ঘন্টাব্যাপী এই মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আবুল মকসুদ, গণ ঐক্যর আহ্বায়ক পংকজ ভট্টাচার্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, গণ আজাদী লীগের নেতা হাজী আবদুস সামাদ, গণতন্ত্রী পার্টির নেতা শাহদাত হোসেন।

মানব বন্ধনে রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য যখন একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঠিক তখনি চুক্তি বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক একটি শক্তি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের এই উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য এই সাম্পদায়িক হামলা সংঘটিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বানচাল করার জন্য বিএনপি, জামাত ও সরকারের একটি মহল এ ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত।'

তিনি দু'জন ছাত্রের মধ্যকার হাতাহাতি থেকে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলায় রূপদানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ করেন। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান এবং সরকারের প্রতি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন ও হামলায় সেনা সদস্যদের ভূমিকাসহ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা নয়, সমতলের আদিবাসী ও দেশের সংখ্যালঘুদেরও হামলা করা হচ্ছে। তিন আরো বলেন, বিশ বছর ধরে আদিবাসীদের উপর এ ধরনের হামলা সংঘটিত হয়ে আসছে। কিন্তু একটারও বিচার হয়নি। ফলে এ ধরনের হামলা বার বার ঘটেই চলেছে। তাই তিনি রাঙ্গামাটি সংঘটিত হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

গণ ঐক্যর আহ্বায়ক পংকজ ভট্টাচার্য এই সাম্প্রদায়িক হামলাকে খুবই নির্মম ও পরিকল্পিত বলে উল্লেখ করে দুই ছাত্রের মধ্যেকার সামান্য হাতহাতির ঘটনাকে পুঁজি করে শহরের বিভিন্ন স্থানে পাহাড়িদের উপর সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পক্ষপাতমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জানান।

বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রতিক পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত কলঙ্কজনক। তিনি এ হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, 'রাঙ্গামাটিতে পাহাড়িদের উপর হামলা একটি সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা। এসময় সেনা বাহিনীর আচরণ ছিল পক্ষপাতমূলক। নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতেই বিভিন্ন আদিবাসী পাহাড়ি এলাকায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করার জন্য এই সব সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও হামলা সংঘটিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। এতে ডা: সুশোভন দেওয়ান, ১২ জন জুম্ম ইউপি চেয়ারম্যান, একজন জুম্ম সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ৮০ জন পাহাড়ি, ২ জন শিক্ষক ও ৫ জন বাঙালি আহত হয় এবং পাহাড়িদের বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাত, ভবনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগার ভাঙচুর করা হয়।

বৌদ্ধপল্লীসহ আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের হামলা ও জমিদখলের প্রতিবাদে ৭ দলের বিক্ষোভ সমাবেশ

বৌদ্ধপল্লীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু, পাহাড়ে ও সমতলে আদিবাসীদের উপর হামলা, অগ্নিসংযোগ, জমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও এসব ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দুর্গাপুজায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে দেশের ৭টি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল।

দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করার চক্রান্ত, রামু-উখিয়া-পটিয়াসহ কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস সাধন, রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় আদিবাসী জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, সমতলের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে জমি ও বসতবাড়ি দখলের প্রতিবাদে গণ ঐক্যের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল), গণ আজাদী লীগ, গণ ঐক্য ও কমিউনিস্ট কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ বেলা ৩:৩০টায় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন, বিক্ষোভ মিছিল ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রাশেদ খান মেনন বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। আজকে রাঙ্গামাটি, রামু, উখিয়া এবং পটিয়াতে যে বর্বর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে তা দেশের গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বানচাল করার জন্য উগ্র মৌলবাদী শক্তি বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে। তাই দেশের এই মৌলবাদী শক্তিকে চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশকে শক্তিশালী করতে হবে।

পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, দেশের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক চক্র সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরীর চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো নির্ভেজাল সেনাশাসন চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাঙ্গামাটিতে পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি বিরোধী সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জনগণের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার সাথে সেনাসদস্যরা দুর্ব্যবহার করেছে। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে রাঙ্গামাটি, রামু, চিরিরবন্দর, দিনাজপুরে সেই চেতনাকে সুপরিকল্পিতভাবে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। দেশের শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাই ৭টি বাম রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আজ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে একটি অভিন্ন সংগ্রামের পথ রচিত হলো।

শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, রাঙ্গামাটি, রামু ও পটিয়াতে সাম্প্রদায়িক হামলার পেছনে একটি বিশেষ শক্তির উস্কানি ও সহযোগিতা ছিল। হামলাকারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাবার কারণে হামলাকারীরা বার বার হামলা করার সাহস ও প্রেরণা পাচ্ছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে টালবাহানা চলছে। রাষ্ট্রের এ ধরণের আচরণ কারো জন্য মঙ্গলজনক নয়। তিনি অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আহবান জানান।

কমিউনিস্ট কেন্দ্রের আহবায়ক ডা: ওয়াজিদুল ইসলাম বলেন, আজকের এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা দেশব্যাপী সংঘটিত সকল সাম্প্রদায়িক হামলার মূল হোতাদের বিচারের কাঠগড়ায় দেখতে চাই। আজকে কেবল রাঙ্গামাটির পাহাড়ি ভাইদের উপর নয়, আজকে কেবল দিনাজপুরে আদিবাসী ভাইদের উপর নয়, আজকে কেবল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর নয় বরং দেশের প্রগতিবাদী মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর এই পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব এবং নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে দেশের পাহাড়ি-আদিবাসী-ধর্মীয় সংখ্যালঘু তথা প্রগতিশীল শক্তিকে সম্মিলিত আন্দোলনে শরিক হতে হবে।

গণসমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টির সম্পাদক নূর মোহম্মদ সেলিম ও বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সাজ্জাদ জহির চন্দন। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা এমপিসহ ৭টি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে, চট্টগ্রামে ৭ রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা

রামু উখিয়া টেকনাফ পটিয়া রাঙামাটিসহ সারাদেশে আদিবাসী–ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ চট্টগ্রামের পুরাতন রেল স্টেশন চত্বরে ৭ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক ও ৭ দলীয় জোটের চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী এ্যাড. আবু হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রামের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, গণ ঐক্য কমিটি চট্টগ্রামের নেতা তপন দত্ত, সাম্যবাদী দল (এমএল) চট্টগ্রামের আহ্বায়ক অমূল্য বড়ুয়া, বাংলাদেশের ওর্য়াকার্স পার্টি চট্টগ্রাম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ইন্দ্র কুমার নাথ, মোক্তার আহমদ, গণ আজাদী লীগের মওলানা নজরুল ইসলাম আশরাফী, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক টোয়েন চাকমা, যুব মৈত্রীর কেন্দ্রীয় বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কায়সার আলম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, রামু উখিয়া টেকনাফ, পাটিয়া, রাঙামাটিতে বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর হামলা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।এই হামলা সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশ থেকে তাড়ানোর ষড়যন্ত্রের অংশ। বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তার অংশ হিসেবে এই হামলা। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসকদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে আবারো পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ফলতঃ মৌলবাদী উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী আজকে অন্য ধর্মের উপর আঘাত হানার সাহস পাচ্ছে।

বক্তারা রাঙামাটিতে সংঘটিত ও সাম্প্রদায়িক হামলার উপর গঠিত প্রশাসনের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়েও প্রশ্ন তুলেন। তারা বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে সেনাবাহিনীর একজন ওয়ারেন্ট অফিসার মো: ওমর কর্তৃক উদ্ধত ব্যবহার কোন সাহসে এবং কার ইন্ধনে করা হয়েছে সেই সব বিষয় তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ নেই বলে অভিযোগ করেন। বক্তারা রাঙামাটি, রামু, উখিয়া, টেকনাফ, পটিয়ায় সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই থানা শাখার ১০ম বার্ষিক সম্মেলন

রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিয়েতনামে পরিণত হবে, হুশিয়ারি বক্তাদের

গত ১৭ অক্টোবর ২০১২ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই থানা শাখার ১০ম বার্ষিক শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ছাত্রনেতা এচিংমং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই উপজেলা শাখার সভাপতি মংনুচিং মারমা, সহ-সভাপতি বিক্রম মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক সংবিধানে আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে অসম্মানজনকভাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বা 'উপজাতি' হিসেবে অভিহিত করা, দেশের সকল নাগরিককে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করে আদিবাসীদের আত্মপরিচয় অস্বীকার করা এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' করা অন্যায় বলে উল্লেখ করেন।

নেতৃবৃন্দ বর্তমান সরকারের সাড়ে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অনেক রক্ত ও অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিয়েতনামে পরিণত হতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের সামগ্রিক স্বার্থে অচিরেই চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ সমবেত ছাত্র ও যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন– 'ছাত্র-যুব সমাজ যদি নিজের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে উদাসীন ও অসচেতন থাকে, তাহলে শাসকগোষ্ঠী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার সুযোগ পাবে। কাজেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।'

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে এচিং মং মারমাকে সভাপতি ও সুজন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই থানা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ধীরেশ চাকমা।

'৫০০টি গুলিসহ দুই পুলিশ আটক' এর ঘটনায় জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা এবং জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যেই '৫০০টি গুলিসহ দুই পুলিশ আটক' এর ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়ানো হচ্ছে বলে জনসংহতি সমিতি দাবি করেছে। গত ১ নভেম্বর ২০১২ তারিখে জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসংহতি সমিতি এ দাবি করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সম্প্রতি দেশের দুই জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো' ও 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় গুলিসহ দুই পুলিশ সদস্য গ্রেফতার হওয়ার ঘটনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ২৬ অক্টোবর ২০১২ প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত '৫০০টি গুলিসহ দুই পুলিশ আটক' শিরোনামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাছে ৫০০টি গুলি পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রির চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে গুলিগুলো তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাচ্ছিলেন।' গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুলিশের গুলির চালানটি যাচ্ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে' শিরোনামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, '৫০০ গুলির অবৈধ চালানটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) কাছে পাঠানোর জন্য সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের দুই সদস্য। ...গত ১৪ বছরে পুলিশের গুলির অবৈধ আরো পাঁচটি চালান জেএসএসের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।'

১০ই নভেম্বর স্মরণে ২০০০
শোক র‍্যালি ও শোক সভা

‘এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে (সংবিধানে) প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।’

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।’

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

‘বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ– কেউ বলে নাই আমি বাঙালি।’

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা